মতামত ও লেখা পাঠানো সহ
সমস্ত ধরণের যোগাযোগ:
সম্পাদক
শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
১১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯
ফোন : ৯৪৩৩২৪২৪৯৮
(বৃহস্পতিবার, ১১-২ টা)
shramikshakti@gmail.com

শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

ভিতরের পাতায়

- মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে
- একচেটিয়া পুঁজির ফাঁসে পঞ্চায়েতীরাজ
- বাবুরাম দেওয়ান : একটি হারিয়ে যেতে বসা কাহিনী
- নিম্নদামোদর অঞ্চলে বছর বছর বন্যার জন্য দায়ী কে?

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা | জুন ২০০৮ | বিনিময়: ২ টাকা

পঞ্চায়েত ভোটের ফল ও সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ : একটি প্রতিবেদন

পিনাকী মিত্র

রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরিয়েছে। শাসকদল এবং বিরোধী দুপক্ষেরই দূরতম কল্পনার বাইরে গিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন। বামফ্রন্টের ৩১ বছরের শাসনকালে এতবড় ধাক্কার মুখোমুখি তাদের কখোনো হতে হয়নি। অপ্রত্যাশিত বলেই এই ধাক্কার তীব্রতা আরও বেশী। খুব স্বাভাবিকভাবেই আবার সামনে চলে এসেছে গত দুবছর যাবৎ বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের পথ চলাকে ঘিরে চলতে থাকা যাবতীয় বিতর্কগুলো। আমরা এই লেখায় পঞ্চায়েতের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষতে সেই পুরোনো বিতর্কন্দ্রলো আবার একটু খুঁচিয়ে তুলব। যেসব সৎ নিষ্ঠাবান পার্টকর্মী ও সমর্থক বা বামমনস্ক মানুষ এখনো এই দলটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের দেখানোর চেষ্টা করব, যে রাস্তায় দলীয় নেতৃত্ব তাঁদের নিয়ে চলেছেন, সেই রাস্তার শেষে কেবলমাত্র ধ্বংস লেখা আছে। আলোচনাটা এইভাবে শুরু করা যেতে পারে: পঞ্চায়েত নির্বাচনের এই ফলাফলকে সিপিএম নেতৃত্ব কিভাবে দেখছেন? এখনো অব্দি আমরা যা যা মন্তব্য পাচ্ছি শুধু সেগুলোকেই যদি কাটাছেঁড়া করা যায়, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জায়গা তৈরী হয়।

১) নেতৃত্বের একাংশ দেখাতে চাইছেন এই ফলাফল এমন কিছু খারাপ নয়। কয়েকটি জেলায় একটু খারাপ হয়েছে। আবার সেটা সামলে নেওয়া যাবে। উল্টে তাঁরা একথাও বলছেন যেভাবে গত দুবছর ধরে মিডিয়া, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং বুদ্ধিজীবিদের একাংশ তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে, সেই দিকটা মাথায় রাখলে এই ফল নাকি যথেষ্ট ভালো। এই প্রসঙ্গে দুটো কথা বলার। প্রথমত:, যাঁরা এই কথা বলছেন, তাঁরা পার্টিকে এই সতর্কবার্তা আগাম দিয়েছিলেন কি? দেননি। কারণ তাঁরা নিজেরাও আন্দাজ করেননি যে এইরকম বিপর্যয় হতে চলেছে। তাহলে খামোখা এখন বাস্তব থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে চাইছেন কেন? পার্টিকর্মীদের প্রকৃত বাস্তবটা না দেখানোর মধ্যে কোন মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে? নাকি গ্রামের গরীব মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতার এই যে বাস্তবতা - সেটা নিজেরাই দেখতে চাইছেন না? দ্বিতীয়ত:, ফলাফল খারাপ হওয়াকে অস্বীকার করা মানেই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে না দেখা। সেটা আরও খারাপ। এবং এইটা হল সিপিএম-এর সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা। যেকোন ডগম্যাটিক রাজনীতি যেভাবে নিজেরা নি:শেষ হয়ে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্তও নিজেদের ভুল-ত্রুটি খুঁজে পায় না, অথবা নিজেরা যেটুকু খুঁজে পায় - শুধু সেটুকুকেই 'ভুল' বলে ভাবে, অন্যের কাছ থেকে, বিশেষত: বিরোধীদের কাছ থেকে কোন সমালোচনা বা ভুল-ত্রুটি সম্পর্কিত মতামত গ্রহণ করতে তাদের সম্মানে লাগে, সিপিএমও এক্ষেত্রে কোন ব্যাতিক্রম তৈরী করতে পারেনি। বিরোধী সমালোচনাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনার কোন সংস্কৃতিই আর অবশিষ্ট নেই দলের মধ্যে। তাই প্রথম থেকেই নেতৃত্বের একাংশ ''ফলাফল তেমন খারাপ হয়নি'' বলার মাধ্যমে আসলে আত্মসমীক্ষার জায়গাটিকেই লঘু করে দিচ্ছেন।

২) দ্বিতীয় যে মতটা উঠে আসছে, সেটা খুবই কমন। বহুদিন ধরেই যেকোন পরাজয়ে সিপিএম এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এইটাই হয়ে থাকে। অন্তত: বাংলার মানুষ শুনে শুনে অভ্যস্ত। সেটা হল : ''মানুষ ভুল বুঝেছেন''। এর মধ্যে যেটা অনুক্ত থাকে, সেটা হল - পার্টি ঠিক বুঝেছে। তো কেউ যদি বিশ্বাস করে যে সে-ই ঠিক, আর বাকীরা ভুল, সে কিরকম আত্মসমালোচনা করবে - সেটা বোঝাই যায়। ফলে এই আত্মসমালোচনা নামক প্রহসনটি থেকে যে কর্মসূচীটি বেরিয়ে আসবে তা হল : মানুষকে আরো ভালো করে 'বোঝাতে' হবে। এই 'বুঝিয়ে দেওয়া' নামক কর্মসূচীটির আবার বহুমুখী তাৎপর্য আছে। যেকোন বোঝানো প্রথমে মিষ্টি কথায় এবং যথেষ্ট বিনয় সহযোগে শুরু হয়। তাতে কাজ না হলে যিনি বোঝাচ্ছেন তিনি ক্রমশ: অধৈর্য হতে থাকেন। এবং তিনি যেহেতু জানেন যে তিনিই ঠিক, তাই যে বুঝতে চাইছে না, তার না বোঝার কোন কারণ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন না, একমাত্র অজ্ঞতা (অশিক্ষিত গাঁ-এর মানুষ হলে) অথবা কায়েমী স্বার্থ (শিক্ষিত শহুরে মানুষ হলে) ছাড়া। তাই বুঝতে না চাওয়া, মানতে না চাওয়া মানুষের গায়ে দুটি ট্যাগ লেগে যায় - হয় 'পিছিয়ে পড়া' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল'। এখন পিছিয়ে পড়াদের কে-ই বা উদ্ধার করবে পার্টি ছাড়া? পার্টিকে সেইসব পিছিয়ে পড়াদের 'বাধ্য' করতে হবে আলোর দিকে এগিয়ে চলতে। সেটা মোটেও অগণতান্ত্রিক নয়, কারণ তার পিছনে রয়েছে পার্টির ভালোমন্দ বিষয়ক 'সঠিক জ্ঞান'। বাবা মা কি সন্তানদের জোর করেই ঠিক কাজটা করান না? তাই পিছিয়ে পড়া মানুষের উপর সদিচ্ছার জোর, বাৎসল্যের জোর খাটানোর যুক্তিজাল তৈরী হয়। আর প্রতিক্রিয়াশীলদের তো আর 'বোঝানো' যাবে না, তাদের 'মানতে বাধ্য করতে' হবে। অতএব শুরু হয় মানতে বাধ্য করার প্রক্রিয়া। বলা বাহুল্য, সেই প্রক্রিয়াটি অহিংস থাকে না সবসময়। কিন্তু সুবিধে

মাঠকলে ম্যানেজার খুন নির্দোষ শ্রমিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানেজমেন্টের চক্রান্তে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ টিটাগড়ের (উঃ চব্বিশ পরগণা) লুমটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং জুটমিল (মাঠকল) এবং মিথ্যে মামলায় সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের ১৭ জন শ্রমিকসহ ১৯ জন গ্রেপ্তার। পি.এফ-এর হিসেব এবং রিটায়ারের পর যৎসামান্য গ্র্যাচুইটি দেওয়া নিয়ে মিলের শ্রমিকদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। এছাড়া আছে ১৩০ টাকা থেকে ৭০ টাকার মধ্যে শ্রমিকদের ভাউচারে খাটানো। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে গত ১২ মে শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের কাছে বিক্ষোভ দেখায়। তখন মিল ম্যানেজার জীতেন্দর শুক্লা শ্রমিকদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী সাতদিনের মধ্যে পি.এফ. এর হিসেব দেওয়া হবে। ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত মিলের সমস্ত শ্রমিকদের জানানোর জন্য গত ১৫ মে বিকেল চারটের সময় এক গেট মিটিং-এর আয়োজন করে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন (এসএমইউ)। সেই সভা শুরু হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সাত-আট জন যুবক (প্রত্যেকের মুখে গামছা বাধা) লাঠি নিয়ে শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের লাঠির আঘাতে অনেকে আহত হয়। তারা মিটিং-এর মাইক, ব্যাটারি ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায় (শ্রমিকদের বক্তব্য, এরা সব স্থানীয় ডোমপাড়ার বাসিন্দা)। তখন প্রায় ২০০-২৫০ শ্রমিক আহতদের নিয়ে খড়দা থানায় এফ আই আর করতে গেলে পুলিশ আলোচনার নাম করে এস এম ইউ-র প্রেসিডেন্ট শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, অলীক চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর সাউ, পীরমহম্মদ সহ ছয়-সাতজনকে থানার ভেতরে আটকে রাখে। এরই মধ্যে বেলঘরিয়া ও টিটাগড় থানা থেকে দুই ভ্যান পুলিস আসে এবং থানার সামনে বসে থাকা শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ লাঠিচার্জ করে তাদের হটিয়ে দেয় এবং অনেককে জোর করে ভ্যানে তুলে নেয়। এস এম ইউ-র প্রেসিডেন্ট শর্মিষ্ঠা চৌধুরী জানান, থানায় আমাদের আটকে রাখার কারণ জানতে চাইলে ওসি বলেন যে, মিলের এক ম্যানেজার (অপূর্ব রায় চৌধুরী) খুন হয়েছে এবং সেই খুনের দায় শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমাকে বাদ দিয়ে বাকিদের ভ্যানে করে বেলঘরিয়া থানায় নিয়ে চলে যায়। এরপরে ম্যানেজমেন্টের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিল ম্যানেজারকে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। আসলে ম্যানেজমেন্টের অন্তর্দ্বন্দের ফলেই এই ম্যানেজার খুন হন এবং এই খুনের দায় শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে কিন্তু তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। শ্রমিকদের বক্তব্য, ১৫ বছর ধরে পিএফ এর কোনো অডিট হয়নি। আর সাতদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এর হিসেব কোনোমতেই দিতে পারবে না। তাই নিজেদেরই একজনকে খুনের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে চাইছে। আর মিল বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে শ্রমিকদের বক্তব্য, এসময় চাহিদা কম থাকায় উৎপাদনও কম হয়। আর কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর এইসময় মাস দুয়েক নানান অজুহাতে মিল বন্ধ রাখে। এই খুনের ঘটনার সুযোগে তারাও মিল বন্ধ করে রেখেছে। গ্রেপ্তার শ্রমিকদের ওপর থেকে মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে মিল খোলার দাবিতে এস এম ইউ এলাকায় লিফলেটিং, পোস্টারিং, এবং মিটিং মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে।

দেখে এলাম নেপালের সংবিধান সভার ভোট

কুশল দেবনাথ

নেপালে সংবিধান সভার নির্বাচন ছিল ১০ এপ্রিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে নেপালে সংবিধান সভার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। ৫ এপ্রিল যাত্রা শুরু। সঙ্গে বিশ্বজিৎ হাজরা। হাওড়া স্টেশনে দেখা হলো প্রদীপ ব্যানার্জী, শৈলেন মিত্র ও পবন পাটেলের সাথে। ৭ তারিখ রক্সৌল হয়ে বীরগঞ্জ পৌঁছালাম। বীরগঞ্জ থেকে পৌঁছালাম ভোজপুরী প্রদেশে। একটি হোটেলে আমাদের সাথে দেখা করলেন নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) দলের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য কমঃ হরিভক্ত কাণ্ডেল ওরফে কমঃ প্রতীক। আমরা কমরেড প্রতীকের কাছ থেকে নেপালের সংবিধান সভার নির্বাচন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, মাওবাদীদের মুখ্য শ্লোগান এবং সংবিধান সভার নির্বাচন সম্পর্কে নেপালি জনগণের মতামত জানতে পারলাম। আরো জানলাম কমঃ প্রতীক পার্টির পক্ষ থেকে ভোজপুরী প্রদেশে কেন্দ্রিয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। নেপালে যেকটি প্রদেশ প্রবল উত্তেজনাপ্রবণ তার মধ্যে ভোজপুরী অন্যতম। নির্বাচনে জেতার বিষয়ে কমঃ প্রতীককে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগছিল সেদিন। উনি বললেন, সংবিধান সভার নির্বাচনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটবে। নেপাল নিজস্ব সংবিধানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাবে। যেহেতু আজকের নির্বাচন হবার পেছনে ১০ বছরের জনযুদ্ধ, ২০০৬ সালের এপ্রিলের নেপালীজনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে রয়েছে এবং ঐ লড়াই গড়ার প্রধান কারিগর ছিল মাওবাদীরা, তাই সংবিধান সভার নির্বাচনে মাওবাদীদের নেপালী জনগণের বেশিরভাগ অংশ সমর্থন করবে। আমরা শুনলাম। কিন্তু পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। হাতের কাছেই ছিল নেপাল থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্র। সেই সংবাদপত্রগুলিতেও কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষণ মাওবাদীরা গরিষ্ঠতা পাবে এমন কথা বলেনি।

বিকেল নাগাদ টাটাসুমো করে কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে যাত্রা শুরু। বেশ কিছুটা রাস্তা মসৃনভাবে যাওয়ার পর গাড়ির চালক মোহন ভাণ্ডারী চক থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে নিয়ে চললো কাঠমাণ্ডুতে। গাড়ির চালক বললেন এই রাস্তা মাওবাদীরা। পি.এল.এ. ও গ্রামের মানুষ যৌথভাবে বানিয়েছে। ফলে অন্তত ৯০ কিলোমিটার দূরত্ব কমে গিয়েছে। গাড়িতে যেতে যেতে চালককে ভোটের বিষয়ে জিজ্ঞেস করাতে চালক বললেন তিনটি দল মাওবাদী, ইউ.এম.এল. এবং নেপালী কংগ্রেস সমান সমান দৌড়াচ্ছে। অল্প হলেও কংগ্রেস কিছুটা এগিয়ে। মাওবাদীরা পাহাড়ি অঞ্চলে ভালো ভোট পাবে। কিন্তু তরাই অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে, ভোট কম পাবে। তবে সংবিধান সভার ভোট নিয়ে দেখলাম খুবই রোমাঞ্চিত। রাত্রি ১০টা নাগাদ আমরা কাঠমাণ্ডু পৌঁছলাম। থামেল অঞ্চলে হোটেল বুদ্ধতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ-কারীদের সাথে সি.এ.ই.ও.এফ. (কনস্টিটিউশন এসেম্বলি ইলেকশন অবজারভেশন ফোরাম)-এর পক্ষ থেকে লক্ষণ পন্থ আমাদের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে নিলেন।

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-র নেতৃত্বে
নেপালের জনগনের বিপ্লবী সংগ্রামের
সাম্প্রতিক বিজয় উপলক্ষ্যে

সংহতি সমারোহ

২৩ শে জুন '০৮, সোমবার, দুপুর ৩ টে
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা

নেপালের বিপ্লবী সংগ্রাম সংহতি উদ্যোগ
পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি সংগ্রামী বামপন্থী দলের একটি যৌথ প্রয়াস

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন '০৮

প্রসঙ্গ : পঞ্চায়েতের ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গের সপ্তম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট তথ্য এখনো হাতে আসেনি। তবে যেটুকু তথ্য হাতে এসেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে সংখ্যাধিক মানুষ সিপিএমের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের রায় জানিয়েছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম এবং নন্দীগ্রাম সংলগ্ন মানুষ সিপিএম-কে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলাফল ঘোষণার পরপরই সারা রাজ্যের মানুষ জানতে চেয়েছেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ফলাফল কি হল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই আজ রাজ্যের প্রতিবাদী মানুষের লড়াই-এর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি জায়গায় সিপিএম জয়ী হলে তাদের ঔদ্ধত্য যে আরো বেড়ে যেত একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

গোটা রাজ্যের যে ফলাফল পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় অর্ধেক আসনে বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি জয়ী হয়েছে। কিন্তু বাসন্তীসহ বিভিন্ন জায়গায় শরিকদলগুলির সঙ্গে সিপিএম-এর যেভাবে সংঘর্ষ হয়েছে তাতে বামফ্রন্টের আসন বলে কিছু হয় কিনা সে প্রশ্নই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আসলে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট হয়েছে সিপিএম বনাম সিপিএম বিরোধীদের মধ্যে। বহু জায়গায় ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এমন কি সিপিআই পর্যন্ত বিরোধীজোটে থেকে ভোটে অংশগ্রহণ করেছে। সব মিলিয়ে সিপিএম-এর অবস্থা বেশ কোনঠাসা। রাজ্যজুরে সিপিএমবিরোধী হাওয়া যে প্রবল ছিল ফলাফলে তা স্পষ্ট।

বিরোধী হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস-বিজেপি-র মত শাসকশ্রেণীর প্রধান দুটি দলও আসন সংখ্যা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে। বিশেষত কংগ্রেস দল ঘোলা জলে মাছ ভালোই ধরেছে। যদিও মুর্শিদাবাদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে তাদের ফল আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে মানুষ যাকে ই জয়ী হওয়ার মতো বিরোধী প্রার্থী বলে মনে করেছেন তাকেই ভোট দিয়েচেন। কোথাও কোথাও বিরোধী প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক ছেড়ে সর্বসম্মত বিরোধী নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

স্বভাবতই এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর রাজনীতি, শিল্পনীতি, অন্যান্য রাজ্যে বা কেন্দ্রীয়স্তরে তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি মানুষের বিবেচনার মধ্যে আসেনি। মানুষ তার নিজের মত করে সিপিএম-এর তথাকথিত শিল্পায়ন বা তার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গণআন্দোলন বিকাশের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আজ পশ্চিমবাংলায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, সেজ আইন ও সেজ প্রকল্প, বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ, খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির বিরোধিতা করা আর সিপিএম-এর বিরোধিতা করা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিনতু মনে রাখতে হবে এইসব নীতির রূপকার একলা সিপিএম নয় । এর কেন্দ্রীয় রূপকার কংগ্রেস-বিজেপি। অন্যান্য রাজ্যে এরা সিপিএম-এর মত একই ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এবারের নির্বাচনে সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলিও তাদের ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ নিয়ে কিছু কিছু আসনে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু তাদের অনৈক্য, নীতি ও কৌশলগত নানারকম ভিন্নতার জন্য জনগনের সামনে একটি রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে উপস্থিত হতে পারেনি। সিপিএম-এর বিপরীতে একটি সাচ্চা বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাব আজ সমাজের সর্বস্তরেই অনুভূত হচ্ছে। বিরোধী জোট তো হল কিন্তু কে তার নেতৃত্ব দেবে? পূর্বে যে সমস্ত বিরোধীরা বোর্ড গঠন করেছিলেন তাদের কেউ কেউ সিপিএম-এর মতই দূর্ণীতিপরায়ন। সর্বপরি তারা পঞ্চায়েত পরিচালনা বা সার্বিকভাবে কোনো বিকল্প পথ মানুষের কাছে রাখতে পারেনি। এই বিকল্প পথ কিছুটা দেখাতে পারতেন সংগ্রামী বামপন্থীরা।

তাই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম ভালো মতো ধাক্কা খেয়েছে। মানুষ সিপিএম-এর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন এটা যেমন আনন্দের দিক, আশার দিক তেমনই সিপিএম-এর প্রকৃত একটা বিকল্প পশ্চিমবঙ্গে গড়ে না ওঠাটা নিঃসন্দেহে এর অন্ধকার দিক। আশা করা যায় সংগ্রামী বামপন্থীরা নিজেদের ঐক্যকে আরো মজবুত করে পশ্চিমবাংলার এই শূণ্যস্থান পূরণে দ্রুত উদ্যোগী হয়ে উঠবেন।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে

অলিক চক্রবর্তী

কদিন আগে একটি মফস্বল শহরে গণনাট্যের একটি পথনাটিকা দেখছিলাম। পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন, তাই সিপিএম পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত ইস্যুগুলি সামনে নিয়ে আসবে বা আসতে পারে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে নাটকটিতে ধরা হয়েছে। তাতে বামফ্রন্ট সরকারের ও পঞ্চায়েতের সাফল্যের মধ্যে বাড়ি বাড়ি স্বল্পমূল্যে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা (যদিও সেটা কতো শতাংশ বাড়িতে সেটা তর্কসাপেক্ষ), ১০০ দিন কাজ, বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা, প্রভৃতির কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা হয়েছে। আর মূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যার কথা এলেই সেগুলি রোধ করার দায়িত্ব কেন্দ্র-সরকারের—তাই সেগুলি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই, এরকমভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সেই সংক্ষিপ্ত পথনাটিকা থেকেই বেরিয়ে এল যে এইভাবে যদি মূল্যবৃদ্ধি হয় তবে কোথায় যাবে কর্মসংস্থানের হাতছানি আর কোথায় পড়ে থাকবে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য!

বিশ্বায়নের সুযোগ কাজে লাগাবার অবধারিত ফল যে আরো বেকারি, দারিদ্র্য ও অনাহার তা শ্রমিকশক্তির পাতায় প্রায় ছত্রে ছত্রে আলোচিত হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত জায়গায় উদারনীতির প্রয়োগ বেশি হয়েছে, সেইসব জায়গায় সাধারণ মানুষের মৃত্যুমিছিল ততো লম্বা হয়েছে। যেমন অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র। অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষকদের আত্মহত্যা, মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের কৃষকদের আত্মহত্যার কথা আজকে সকলেই জানে। এমনকী এই পশ্চিমবঙ্গেও আলুচাষীর আত্মহত্যার কথা আজকে শোনা যাচ্ছে। বুদ্ধবাবু যত চন্দ্রবাবুর পথ অনুসরণ করছে এই ঘটনা ততোই বাড়ছে। আর সারা ভারতে যে পরিমাণে তথাকথিত সংস্কারের রথ এগিয়ে চলেছে মানুষের অবস্থা ততোই খারাপের দিকে যাচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি হল সেই অবস্থার একটি নিদর্শন মাত্র।

বাজারে আগুন লাগার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যগুলিকে দোষারোপ করছে আর রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে। এইভাবে দোষারোপের পালা চলছে। কিন্তু এই খোলাবাজারি অর্থনীতিটাই যে একমাত্র কারণ সেটা এরা কেউ বলছে না। একটু চিন্তা করলেই এই কারণটা বোঝা যাবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির যে কারণগুলো সবাই জানেন সেগুলোকে একে একে সাজালে এরকম—(১) মুদ্রাস্ফীতি, অর্থাৎ বাজারে প্রচুর টাকা ছাড়া হয়েছে, (২) মৌলিক জিনিসপত্রের অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়লে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ে সেই ধরনের সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি, (৩) চাহিদার তুলনায় যোগান কম, (৪) অবৈধ মজুত।

মোটামুটি এই চারটি কারণকে মৌলিক বলে ধরা যেতে পারে। এর মধ্যে মুদ্রাস্ফীতিকে সরকার কখনো কখনো যে রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা ভয়ংকর। বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে ঢালাও অনুমতি দিয়ে দেওয়ার ফলে সেখান থেকে যে রাজস্ব সংগৃহীত হচ্ছে তা দিয়ে অতিরিক্ত মুদ্রার চাহিদা পূরণ করার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বিনিয়োগের সবচেয়ে ভাল উৎস হল শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ। সেখানে ফাটকা খেলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যে ব্যাপক মুনাফা করছে তার একটা অংশ রাজস্বখাতে আসার ফলে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার স্ফীত হচ্ছে। তাই মুদ্রাস্ফীতি কমার অর্থ হল শেয়ার বাজারে ভাল ব্যবসা। সারা দেশের মানুষের কেনাকাটার সামর্থ্য বাড়ল কিনা সেটা এখানে কোনও মানদণ্ডই নয়। আর এই হিসাব থেকেই জাতীয় উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার হিসেব দেওয়া হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হিসেব দেওয়া হয়। আর আমরা দেখি বছর অন্তে কয়েকজন বিলিয়নারের আরো কয়েক বিলিয়ন সম্পত্তি বেড়ে গেল। তাদের 'অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা বাড়ছে' ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতা কমে গেল তার হিসেবটা কে নেবে?

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কম থাকলে অন্যান্য জিনিসের দাম কম থাকতে পারে সেই সমস্ত পণ্য যেমন পেট্রল বা ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও ব্যবস্থা না নেওয়াই এই খোলা বাজার অর্থনীতির নীতি। দেশ থেকে পেট্রলিয়ামজাত সামগ্রীর উৎপাদন যতটা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা করা হয়েছে। পেট্রল, ডিজেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সামগ্রীকে আমদানী করার ওপরেই নির্ভর করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বিশ্বের বাজারে দাম বাড়লেই দেশের সমস্ত জিনিসের দাম হুহু করে বাড়তে থাকে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা অবলম্বনের বদলে সরকার পেট্রল ডিজেল আমদানী শুল্কের মাধ্যমে বিরাট অঙ্কের টাকা নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করে। সেই শুল্কে ছাড় দিলেও পেট্রল ডিজেলের দাম একলাফে অর্ধেক কমে যেতে পারত। কিন্তু খোলাবাজারি অর্থনীতিতে রপ্তানী ও বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে যে বিপুল ছাড় দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারের কাছে এই পেট্রল, ডিজেলের আমদানী শুল্কের ওপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য পথ খোলা নেই। তাই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হল মূল্যবৃদ্ধি।

তৃতীয়ত, খোলা বাজারি অর্থনীতিতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের রপ্তানীকে অবাধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে সেই সামগ্রী ইচ্ছামতো দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। রপ্তানীমুখী বাণিজ্যে দেশের প্রয়োজন মেটানোটা যেহেতু গৌণ তাই সেই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাজারের স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে কালোবাজারি ও ফাটকাবাজেরা সেই সমস্ত সামগ্রীকে ইচ্ছেমতো মজুত করে দাম আরো ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বন্টনের ক্ষেত্রে সরকার যতো হাত গুটিয়ে নিয়েছে মজুতদারেরা ও রপ্তানিকারকেরা জিনিসপত্র ততো চড়া দামে বাজারে ছাড়ছে ও ইচ্ছামতো মজুত করে জিনিসপত্রের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে।

এই সমস্ত কারণকে একটি জায়গায়, উৎসমূল থেকে বিচার করলে একটা কথাই বলা যায়। সেটা হল একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সারা দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে যেভাবে রূপায়িত করা হচ্ছে তার অবধারিত ফলাফল হিসেবে এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। আর আমাদের রাজ্যের লালঝাণ্ডাধারী সরকার সেই নীতির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে না তুলে সেই নীতির পায়ে নিজেদের সমর্পণ করেছে। এই রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কম রাখার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব সেই ব্যবস্থাও তারা নেবে না। যখন সর্ষের মরসুমে নতুন সর্ষে উঠছে তখন সর্ষের তেলের মূল্য একলাফে কী করে ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা হয়ে যায় তার উত্তর কেউই দিতে পারে না। সর্ষে ওঠার সময় এই দাম কমার কথা। আর যখন সর্ষে উঠছে তখন নিশ্চয়ই বিশ্বের বাজার থেকে ভোজ্য তেল সংগ্রহ করতে হবে না। কিন্তু ঘটনা হল যে মজুতদারেরা বিশ্বের বাজারে দামবৃদ্ধির সুযোগ নিতে ব্যাপক মজুত করছে ও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশেও পাঠাচ্ছে। মজুতদারীকে নিষিদ্ধ করার বদলে, জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেওয়ার বদলে, বামফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে মূল্যবৃদ্ধির জন্য দোষারোপ করে তাদের দায়িত্ব শেষ করছে। ফলস্বরূপ, মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী লাফ দিয়ে কমে যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের যে গালভরা বুলি আউড়ে যাওয়া হচ্ছে তার আসল চেহারাটা এই মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে বেরিয়ে পড়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার তথা বামফ্রন্ট মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লম্বা চওড়া বক্তৃতা না ঝেড়ে যদি সত্যিই কিছু কাজ করতো, যদি মূল্যবৃদ্ধির অর্থনীতির রূপকার কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতো, যদি রাজ্য সরকার থেকে রাজ্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেত ও মজুতদারদের মজুত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতো তবে অন্তত এরাজ্যের মানুষকে এইরকম ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির শিকার হতে হতো না। কিন্তু সেই রাস্তায় তারা হাঁটবে না। কারণ সেটা তো একচেটিয়া পুঁজির না পসন্দ্। পুঁজিবাদ ও তার আজকের রূপ একচেটিয়া পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া যে পথ নেই সেই সত্যটাকেই তারা আড়াল করে মানুষকে দু-একটা খুচরো সংস্কারের আবর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে আরো বড়ো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গণনাট্যের পথনাটিকাটি এই বিপর্যয়টাকে আড়াল করে শাসকশ্রেণীর নীতিকে রূপায়িত করার কাজে ভালই ভূমিকা পালন করছে।

ভি.আর.এস.-এর ক্ষতিপূরণ ও মিল চালানোর দাবিতে শ্রমিক-নাগরিক কনভেনশন

প্রদীপ রায় : গত ২০ এপ্রিল সাঁকরাইলের দরগাতলার অনিন্দিতা-অঙ্কিতা হলে ন্যাশনাল জুট মিলের এক্সট্রা ক্যাজুয়াল মজদুর মঞ্চের আহ্বানে আয়োজন করা হয় এক শ্রমিক-নাগরিক কনভেন-শনের। উল্লেখ্য ২০০৫ সালের ১০ জুলাই মিল কর্তৃপক্ষ এক নোটিশ জারি করে সমস্ত শ্রমিককে ভি.আর.এস. (স্বেচ্ছা অবর প্রকল্প) দেবার কথা ঘোষণা করে। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কাজ করা নিয়মিত নন পি.এফ. এক্সট্রা ক্যাসুয়াল নামে পরিচিত প্রায় ২৩০০ শ্রমিককে কর্তৃপক্ষ জানায় যে সবার শেষে তাদের ভি.আর.এস.-এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ২০০৭ সালের ২৮ জানুয়ারি শ্রমিকদের হাজিরা বন্ধ করে দেওয়া হলে এই শ্রমিকদের মধ্যে ভি.আর.এস.-এর ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৭ সালের ২৮ জুলাই দলমত নির্বিশেষে এক গণকন্‌ভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এই এক্সট্রা ক্যাসুয়াল মজদুর মঞ্চ। গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর গড়ে ওঠা এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মিল কর্তপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়া হলে মিল কর্তৃপক্ষ জানায়, পি.এফ. বহির্ভূত কোনো শ্রমিককে ভি.আর.এস.-এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগঠনের ডাকে ইতিমধ্যে রিলে অনশন, গণঅবস্থান, মিছিল, পথসভা প্রভৃতি বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এছাড়া গত মাসে মিলের ৪৯৪ জন নন্ পি.এফ. এক্সট্রা ক্যাসুয়াল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ন্যাশনাল জুট মিলকে আবারো ভালভাবে চালু করার দাবি শ্রমিকরা তুলে ধরে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক এন.জে.এম.সি. অধীনস্ত ছয়টি মিলের মধ্যে দুটি কারখানা (খড়দহ জুট মিল ও কিনিসন্ জুট) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চালানো হবে। বাকি চারটি কারখানা (ন্যাশনাল জুট, আলেক্‌জান্দ্রা জুট, ইউনিয়ন নর্থ জুট ও কাটিহার জুট)-এর ভবিষ্যত কি হবে তা এখনও অন্ধকারময়। ইতিমধ্যে এই ছ'টি কারখানার প্রায় বিশ হাজার শ্রমিককে ভি.আর.এস. দিয়ে বিদায় জানানো হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই কন্‌ভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কন্‌ভেনশনে এলাকার ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতেই কন্‌ভেনশনের প্রস্তাব পেশ করেন মজদুর সঙ্ঘের আহ্বায়ক জয়দেব মান্না। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল জুটের শ্রমিক তথা এই আন্দোলনের আগুয়া কর্মী সুনিল দাস ও অরুণ সেন। উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে খড়দহ জুটের শ্রমিক প্রতিনিধি রহমতুল্লা ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক কর্মী কুশল দেবনাথ এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হলে আইনী লড়াই-এর পাশাপাশি প্রয়োজন উত্তাল আন্দোলনও। সভায় উপস্থিত শ্রমিক ও নাগরিকদের সমর্থন ও করতালিয় মধ্য দিয়ে সভায় পেশ করা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও কর্মসংস্থান : একটি বিতর্ক

চতুর্থ পর্ব

চন্দন দেবনাথ

গত দু'টো সংখ্যায় আলোচ্য বিষয়ে অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুরী ও প্রভাত পট্টনায়কের বক্তব্য ও অভিমতকে সামনে আনা হয়েছিল। এর পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য ছিল। এক, চালু বিশ্বায়নপন্থীদের তথাকথিত বিপরীত শিবিরভুক্ত অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের সাথে এই পত্রিকার যে পাঠকরা তেমন পরিচিত নন, তাঁদের পরিচয় ঘটানো। বাজারী কাগজগুলোতে আমরা বিশ্বায়নপন্থীদের বক্তব্যই সাধারণত পেয়ে থাকি। মাঝেমধ্যে অন্য বক্তব্য প্রকাশিত হলেও সেসব নিয়ে আমাদের মধ্যে চর্চা হয় সামান্যই। একইভাবে তেমন চর্চিত নয় ভাদুরী এবং পট্টনায়কদের মতো বক্তব্যগুলোও। আরও এই কারণে যে, এগুলো বাজারী দৈনিকে তেমন প্রকাশিত হয়ও না। কিন্তু এগুলোও আমাদের জানাবোঝা দরকার, বিশ্বায়নবিরোধী স্রোতের বিপথগামী হওয়াকে রোধ করার স্বার্থে। সত্যি সত্যিই তাকে পুঁজিবিরোধী দিশায় চালিত করার স্বার্থে। কারণ এ নিয়ে তো আমাদের মধ্যে দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, বিশ্বায়নের হামলা মানে আসলে পুঁজিরই হামলা। তাই, যদি দেখা যায় আপাতভাবে বিশ্বায়নবিরোধী কোনও বক্তব্য অন্তর্বস্তুতে পুঁজিবিরোধী আসলে নয়, সেই বক্তব্য আমাদের বর্জন করাই উচিত। এই লেখকের নজরে ভাদুরী এবং পট্টনায়কের লেখা দু'টিকে সেই চরিত্রের বলেই মনে হয়েছে। যদিও পট্টনায়ক একজন স্বঘোষিত মার্কসবাদী, কিন্তু ভাদুরী তা নন।

এই দুই অর্থনীতিবিদের লেখাকে সামনে আনার পেছনে অন্য বিবেচনা ছিল এই যে, বেকার সমস্যা সম্পর্কে বর্তমান লেখকের বক্তব্যকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। লক্ষণীয় যে, বেকার সমস্যার বুনিয়াদী কারণের সামান্য উল্লেখটুকুও ভাদুরীর লেখাতে ছিল না। আর পট্টনায়কের লেখাতে যতটুকু ছিল, তা না থাকারই সমান। সুতরাং ভাবতেই হয়, সমস্যার বুনিয়াদী কারণ নিয়ে এই নীরবতার অর্থটা কী? কেন আমরা সোজাসাপটা, দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলবো না যে, বেকার সমস্যার বুনিয়াদী কারণ হল এই বাস্তবতা যে, যে সমাজটায় আমরা বাস করছি, সেটা তার জন্মলগ্ন থেকেই বিভাজিত হয়ে আছে সুস্পষ্ট দু'টো অংশে একদিকে তথাকথিত 'নিয়োগকারীরা' আর অন্যদিকে অসংখ্য 'কর্মপ্রার্থী' এবং 'নিয়োগপ্রাপ্তরা'? কেন শুরুতেই আমরা প্রশ্ন করব না এই সামাজিক বিভাজনটাকেই? সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় উৎপাদন কার্যে কেন আমরা মুক্তভাবে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবো না? এর জন্য 'সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের' কাছে কেন আমাদের 'আবেদন' করতে হবে, যদি না বলা হয় ভিক্ষে চাইতে হবে? আর এর জন্য কেনই বা আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে? শুরুতেই আমরা এইসব প্রশ্নের দ্বারা আমরা চালিত হব না কেন? আলোচ্য বিষয়ে এই প্রশ্নগুলো কি অপ্রাসঙ্গিক? হ্যাঁ, নিয়োগকারীদের কাছে এগুলো নিশ্চয় 'উদ্ভট প্রশ্ন'। কিন্তু বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি যাঁরা চান, তাঁদের কাছে নিশ্চয় খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একটাই সামাজিক উৎপাদনের মূল হাতিয়ারগুলো কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে আর আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি সেসব থেকে। সেসবের মালিক যারা, তাদের দরকার আমাদের শ্রমক্ষমতা—শুধুই উৎপাদনের জন্য নয়, আমাদের শ্রম শোষণ মারফৎ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের স্বার্থে, একমাত্র যেটাই হল তাদের কাঙ্খিত মুনাফার উৎস। এবং শুধু এই কারণেই তারা আমাদের 'নিয়োগ' করে। আর অন্যদিকে, সমাজে নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই আমরা তাদের দ্বারা 'নিয়োজিত' হবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করি। বলাই বাহুল্য যে, আমাদের মধ্যে ক'জনের 'নিয়োগপ্রাপ্তির' সৌভাগ্য হবে, এবং সেটাও কী শর্তে, তা নির্ধারিত হবে 'নিয়োগকারীদের' মুনাফা অর্জনের স্বার্থ দ্বারা। একমাত্র সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জোরেই নিয়োগকারীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। তবে সেটা অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন তো নয়। বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি সেটা নয়।

সুতরাং এটা যদিও একটা অপরিবর্তনীয় সত্য যে, মানব সমাজের অস্তিত্বের মৌলিক শর্ত হল মানুষের উৎপাদনী শ্রম, প্রকৃত উৎপাদকদের (অর্থাৎ শ্রমিকদের) এবং 'কর্মপ্রার্থীদের' ভাগ্য ন্যস্ত হয়ে আছে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর মালিকদের হাতে! এটাই হল চালু 'নিয়োগব্যবস্থার' মর্মবস্তু, প্রতিনিয়ত যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়। পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক আবির্ভাব বহু বছর আগেই এই ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে—মনুষ্য শ্রমক্ষমতার পণ্যায়নের উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে যে ব্যবস্থা, যে পণ্যের ক্রেতাদের মোলায়েম ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'নিয়োগকর্তা' বা 'নিয়োগকারী'। এবং ঠিক এই নিয়োগব্যবস্থাটাই বেকারসমস্যা নামক সামাজিক সমস্যাটার আসল কারণ। সমস্যার মাত্রা বা তীব্রতায় ফারাক থাকলেও আসল কারণ সর্বত্র এটাই। ঠিক এই কারণেই 'পুঁজিবাদের স্বর্গ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র গত ফেব্রুয়ারিতেই ৬৩ হাজার 'চাকরি' খোয়া গেছে বলে খবর আজও আমাদের শুনতে হয়। বাজারী কাগজে কারণ হিসাবে যদিও বলা হচ্ছে মার্কিন অর্থনীতির বর্তমান মন্দার কথা বাজারে চাহিদা কমে যাবার কারণে উৎপাদনে রাশ টেনে ধরতে হচ্ছে, ফলে 'উদ্বৃত্ত কর্মী'র সংখ্যা বাড়ছে, 'চাকরি' খোয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন তো এখানেই বাজার মন্দা হলে কর্মী সংখ্যা 'উদ্বৃত্ত' কেন হবে? এর উত্তর তো বাজারে খুঁজলে হবে না, খুঁজতে হবে চালু উৎপাদন ব্যবস্থাটার মধ্যেই, যেখানে কর্মী বা প্রকৃত উৎপাদকের কাজ নিছক উৎপাদন নয়, কাজ হল নিয়োগকারীর জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন। আর বাজার হল সেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে মুনাফা রূপে উশুল করার ক্ষেত্রে। বাজার মন্দা মানে এই উশুল করার সমস্যা, অর্থাৎ মুনাফার হারের পতন। নিয়োগকারী পুঁজিপতির কাছে এই সমস্যার আশু সমাধান হল, 'মজুরি খাতে খরচ' কমানো। যার অন্যতম উপায় হল কর্মী সংকোচন। অর্থাৎ চালু উৎপাদন তথা নিয়োগব্যবস্থায় কর্মী সংকোচনের মতো কর্মী নিয়োগের চরিত্রটাও নির্দ্ধারিত হয় 'নিয়োগকারীর' মুনাফা অর্জনের স্বার্থ দ্বারা। এই ব্যবস্থাটা বদলে ফেলতে না পারলে বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি কীভাবে সম্ভব? ভাদুরীর মতো পট্টনায়কও আসলে এই প্রশ্নটাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গেছেন। সত্যটাকে সজোরে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, সামনে আনতে চাননি। বস্তুত, ভাদুরীর মতো পট্টনায়কও আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র সরকারের পলিসি পাল্টেই দেশের বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। হ্যাঁ সম্ভব, যদি তা হয় সত্যিই পুঁজিবিরোধী পলিসি, সরাসরিভাবে পুঁজির উচ্ছেদকল্পেই যা চালিত। পুঁজির সামাজিক প্রভুত্বের জমানায় যে পলিসির অর্থ রীতিমতো একটা সমাজ বিপ্লব। কীসের জোরে ঘটানো যায় তেমন বিপ্লব, আমরা যেমন জানি, ওঁরাও জানেন। স্বভাবতই তেমন পলিসির কথা তাঁরা বলেনওনি। বলেননি এই কারণে নয় যে, তেমন বিপ্লব ঘটাবার মতো বাস্তবতা এই মুহূর্তে নেই বলে। বলেননি এই কারণে যে, তেমন বক্তব্যের অর্থ দাঁড়াবে পুঁজিবিরোধী অবস্থান নেওয়া। ভাদুরীর মতো পট্টনায়কেরও এখানে সমস্যা আছে বলেই মনে হয়।

আগেই আমরা দেখেছি, ভারত সহ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলোর বেকার সমস্যার কারণ হিসাবে পট্টনায়ক চিহ্নিত করেছেন দেশীয় অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ফিনান্স পুঁজির কব্জাকে, পুঁজিবাদকে নয়। এবং এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবার একটা উপায়ও তিনি বাতলেছেন ঐ ফিনান্স পুঁজির সাথে সংযোগ ছিন্ন ক'রে দেশীয় অর্থনীতির 'স্বাধীন বিকাশের নীতি' গ্রহণ করা, যে পথে লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ এখন চলছে বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে যে দেশটির নাম আমরা এখন সবথেকে বেশি শুনতে পাই, সেটা হল ভেনেজুয়েলা, হুগো শাভেজ এখন যার রাষ্ট্রপতি। কিন্তু শাভেজ অনুসৃত নীতি কি সত্যিই সেখানে বেকার সমস্যা বিলোপের পথ পরিষ্কার ক'রে চলেছে? সেখানকার ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অবস্থাও কি খুব উৎসাহব্যঞ্জক? বলা হয়েছিল, এসব ক্ষেত্রে অন্তত সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাস্তবে চিত্রটা কিন্তু মোটেই সেরকম নয় বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। সংস্থা পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিকতাটাই মুখ্য দিক হিসাবে বিরাজ করছে। দুঃখজনক ব্যাপার হল, শ্রমিকদের দিক থেকেও কিন্তু এই অবস্থাটা পাল্টানোর তেমন কোনও সক্রিয় উদ্যোগ নেই। আর পুঁজিপতিরাও তো এরকমটাই চায়। সুতরাং এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয় যে, সেখানেও শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্যই কায়েম আছে। এটা ভাঙতে না পারলে বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি কি সম্ভব? তবে হ্যাঁ, পট্টনায়ক বলতেই পারেন, মুক্তির কথা তিনি বলেননি, বলেছেন বেকার সমস্যা অনেকখানি লাঘব হবার সম্ভাবনার কথা। এখন প্রশ্ন হল, যদি এটা সম্ভবও হয়, সেই সাফল্যকে কি ধরে রাখা যাবে, যদি না পুঁজির উচ্ছেদকল্পে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতন বাস্তব সংগ্রাম জারি থাকে? একদা কেইন্সীয় মডেলের অধীনে যে আপাত নিরাপত্তা পশ্চিম ইওরোপের শ্রমিকরা ভোগ করছিলেন, সেটা কি ধরে রাখা গেছে?

আসলে যতই আমরা 'সমস্ত বেকারের কাজ চাই' দাবি তুলি না কেন, প্রয়োজন কিন্তু চালু নিয়োগব্যবস্থাটাই আমূল বদলে দেওয়া, যে ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে মনুষ্য শ্রমক্ষমতার পণ্যায়নের উপর ভিত্তি ক'রে। অর্থাৎ দরকার, শ্রমক্ষমতার বি-পণ্যায়ন। এর জন্য আবার দরকার, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর সামাজিকীকরণ। ভাদুরীর মতো পট্টানায়কের 'জনমুখী প্রস্তাবের' অভিমুখও কিন্তু মোটেই এদিকে নয়। সবই হল পুঁজিবাদের মধ্যেই সুখের স্বর্গ(!) রচনার প্রস্তাব, পুঁজিবাদকে 'মানবিক মুখ' প্রদানের প্রয়াস মাত্র। ভাদুরীর সাথে পট্টনায়কের তফাৎ একটাই ভাদুরী কোথাও এই আভাস দিতে চাননি যে তিনি পুঁজিবাদ বিরোধী, অথচ পট্টনায়ক কিন্তু মার্কসবাদী তকমাটা এখনও রাখতে চান।

নিম্নদামোদর অঞ্চলে বছর বছর বন্যার জন্য দায়ী কে?

অজয় বেরা

বর্ধমানের দক্ষিণ দিক থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ বিগত ৪০ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ডি.ভি.সি. পরিকল্পনার নাম দিয়েছে 'ডুবানো ভাসানো কর্পোরেশন'। বন্যায় প্রতি বছর জলের উচ্চতাবৃদ্ধি—বন্যাজলের মারাত্মক ক্ষতিকারক কুফল—ফসলহানি নদী ও কাটাখাল (কানানদী) গুলিতে পলি জমে প্রতিবছর জলের উচ্চতা বৃদ্ধি—জলপথ পরিবহনের অন্তিমশয্যা—জীবজন্তুর প্রাণহানি—বাসস্থান হারিয়ে নতুন বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি মিলিয়ে এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটের মুখোমুখি প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ মানুষ। ডি.ভি.সি. পরিকল্পনার কল্যাণে নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারি ব্যর্থতা নিম্নদামোদরের ৫০/৬০ লক্ষ মানুষের এলাকাকে ছাপিয়ে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের অভূতপূর্ব ক্ষতি করেছে। নদীর জলের অভাবে জোয়ার ভাটার পলি শুধু রূপনারায়ণের নাব্যতাই কমায়নি, পাশাপাশি গঙ্গার শেষাংশ হুগলী নদীকে মজিয়ে কলকাতা বন্দরেরও সর্বনাশ করেছে। ডি.ভি.সি.-র ভ্রান্ত পরিকল্পনাকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করা এবং দক্ষিণবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনবসতি এলাকার জীবনজীবিকা সুরক্ষার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ও সরকারি ব্যর্থতার প্রতিবাদে এখানকার জনগণকে সোচ্চার হতে হবে। দামোদর পরিকল্পনার মূল উদ্যোক্তা স্বাধীনতা পূর্ব-যুগের ইংরেজ সরকারের কাছে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা অপেক্ষা সাম্রাজ্যবাদী লাভালাভের অঙ্কই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল একথা সকলেই জানেন। প্রকল্প রূপায়ণকারী স্বাধীন দেশের তৎকালীন সরকারও সেই ভ্রান্ত পরিকল্পনাকে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে অন্ধভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করেছে। এত মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা তারা মামুলি কথা বলে এড়িয়ে গেল অথবা বুঝতেই চাইল না। যারা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাল, সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধী রাজনীতি গড়তে এগিয়ে এল—তারা বামপন্থীরা। এরা ছয়ের দশক থেকে এই এলাকার জনগণকে নিয়ে নিম্ন দামোদরের সমস্যা সমাধানকল্পে বিরোধী রাজনীতিকে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরল। এই আন্দোলনই হল এই এলাকায় বিরোধী বামপন্থী রাজনীতির প্রধান ভিত্তি। এই ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই তারা পাকাপোক্ত সংগঠনও তৈরি করল। ১৯৭৭ সালে এই রাজ্যে বাম সরকার তৈরির পরে 'নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা' নামে একটি প্রকল্প তৈরি হল এবং দিল্লী সরকারের কাছে পাঠানো হল। ঐ পরিকল্পনা অনুমোদিতও হল। এরপর রাজ্য সরকারের তরফে টাকার অভাবের অজুহাত শুরু হল। কর্মীদের বোঝানো শুরু হলো যে একটি রাজ্যের সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় এই নিয়ে কিছু করতে পারবে না। বিপ্লব সমাধা করে সারা দেশের ওপর বিপ্লবী সরকার হলে তবেই কিছু করতে পারবে। ইতিমধ্যে রাজনীতির জগৎকে হিংসা ও দুর্নীতি দখল করে নিল। বামেদের সচেতন কর্মীরা জনগণের সঙ্গে একযোগে এ ঘটনাকে জনগণের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ বলেই মনে করেন। কিন্তু করে খাওয়ার তাগিদে-ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার তাগিদে-নেতাদের ভয়ে-মুখ খুলতেও পারেন না। এখন বামেরা দিল্লীর সরকারের অংশীদার হয়ে আর টাকার অভাবের কথা বলছে না। দিল্লী সরকারের ঘাড়েও দায় চাপাতে পারছে না। তাহলে অনুমোদিত প্রকল্পটির কাজ শুরু করতে বাধা কোথায়? বাধা হলো জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব। জনগণের প্রতি-দায়বদ্ধতার উপরে তাদের কাছে স্থান হলো ক্ষমতার রাজনৈতিক ছড়ির। সুতরাং আজ এই দায়িত্ব আমাদের-এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার, মাথা ঘামানোর, প্রতিকারকল্পে লড়াই গড়ে তোলার। আমরা, এই এলাকার ভুক্তভোগী এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ বামকর্মীরা এই দায় অনুভব করি। সেই বোধ থেকেই এই আলোচনার অবতারণা।

ভূমিকা নিম্নদামোদরের সমস্যা যে দক্ষিণবঙ্গের প্রধানতম সমস্যা, এবং এই সমস্যা দঃ বঙ্গের আর্থ সামাজিক ও পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বিমত নেই। এই ভয়াবহ সমস্যা সম্পর্কে অতীতে নদী বিশেষজ্ঞরা অনেকেই সতর্ক করেছিলেন। তাই ইংরেজরা যখন তাদের নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য দামোদর নদীতে ক্রশবাঁধ দিয়ে তাদের শোষণের স্বার্থ বজায় রাখতে চাইল তখনই ডঃ মেঘনাদ সাহা, কপিল ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা আপত্তি জানালেন। ১৯৪৩ সালে নিম্নদামোদরে বন্যাকে অজুহাত করে তারা পরিকল্পনার স্বপক্ষে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সারবত্তাহীন কথাও বললেন। ইতিমধ্যে এদেশের ইংরেজ শাসকরা বর্ধমানের রেললাইন বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দামোদর নদের উত্তর-পূর্ব পাড়ে বাঁধ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। আবার নিম্নদামোদরের দক্ষিণনাংশ দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথকে বাঁচানোর জন্য রূপনারায়ণের তীর বরাবর বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কপিল ভট্টাচার্য বললেন "এই পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখবার স্বার্থেই আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। পরিকল্পনার এই কর্মসূচী সমীক্ষা করলেই বুঝতে কষ্ট হয় না মোটেই, কী দারুণ ষড়যন্ত্রের জালে আমরা আটকা পড়ে গিয়েছি, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলার মানুষ মাঝে মাঝে দামোদরের উদ্দাম বন্যার ধ্বংসলীলায় আকুল হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। তাদের এই ক্রন্দনের সুযোগ নিয়ে চতুর সাম্রাজ্যবাদীরা, তার নিজের মতলব হাসিল করবার এক ফন্দির ফাঁদ পেতেছে।"

দমোদর পরিকল্পনা শুধু যে দামোদরের নিম্নাংশের মানুষের সর্বনাশের মূল কারণ হয়েছে তাই নয় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে কিভাবে বিশাল সর্বনাশের দোর গোড়ায় পৌঁছেছে সেটির আলোচনা এই নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অতীত ভুলের ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়াও এই নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। এবারে দেখে নেওয়া যাক নিম্ন-দামোদর এলাকা বলতে আপাতত কোন এলাকাকে বোঝায়। এবং কেনই বা নিম্ন দামোদরের সমস্যাকে দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)

পঞ্চায়েত ভোটের ফল ও সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ : একটি প্রতিবেদন

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

হল, সহিংস হলেও, তার আগেই কিন্তু সেই হিংসার স্বপক্ষে একট মজবুত জাস্টিফকেশন মনের গভীরে তৈরী হয়ে গেছে। এইভাবেই একটা আপাত: গণতান্ত্রিক এবং বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গী অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে নিজের ভিতরেই হিংসা আর অগণতন্ত্রের বীজ বয়ে নিয়ে চলে।

৩) গত দুই বছরে এই প্রথম সিপিএম নেতৃত্ব স্বীকার করলেন "ঔদ্ধত্য" তাঁদের জনবিচ্ছিন্নতার একটা কারণ। কিন্তু তাঁরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে নিচুতলার কর্মীদের ঔদ্ধত্যের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটা আর একটা গা বাঁচানো বক্তব্য এবং সত্য থেকে বহুদূরে। নিচুতলার কর্মীদের কাছে অসম্মানজনকও বটে। সত্যটা এইটাই যে ঔদ্ধত্য অনেক বেশী দেখিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই "আমরা ২৩৫, ওরা ৩০, আমাদের কে আটকাবে?" থেকে শুরু করে "পেইড ব্যাক ইন দেয়ার ওন কয়েন", "লাইফ হেল করে দেব" বা সাম্প্রতিক কালে রাজ্যপাল বা 'স্বজন' এর উদ্দেশ্যে করা মন্তব্যগুলো যদি এক এক করে রাখা যায়, দেখা যাবে ঔদ্ধত্যের তালিকায় সবার উপরে নাম থাকবে বুদ্ধ, বিমান, বিনয় ও শ্যামলবাবুদের। (সুভাষ চক্রবর্তী বা লক্ষ্মণ শেঠ এর নাম উল্লেখ করলাম না, কারণ কোন বামপন্থা বিষয়ক অলোচনায় এদের নাম আনা মানে আলোচনাটিকে দূষিত করা)। বলা যায় অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁরা এই ঔদ্ধত্যকে নিচুতলায় পারকোলেট করেছেন। গোটা নন্দীগ্রাম পর্বে নিজেদের পার্টিকে উজ্জীবিত করতে দিনের পর দিন ভায়োলেন্স-এ উস্কানি দিয়েছেন। সমাজবিরোধীদের দিয়ে নন্দীগ্রাম দখল অভিযানকে জাস্টিফাই করতে গোটা পার্টিকে "যুদ্ধং দেহি" মুড়ে নিয়ে গেছেন। "মার এর বদলা মার" - এটাকে গোটা পার্টির টিউন বানিয়ে ফেলেছেন, এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন গণফৌজ মার্চ করছে নন্দীগ্রামে (অথচ সত্যটা হল সমাজবিরোধীরা মার্চ করছিল তখন), ভেবেছিলেন assertively যদি একবার নন্দীগ্রামের দখলটা নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই ওটাকে কেশপুর বানিয়ে দেওয়া যাবে আর গোটা বাংলার গ্রামের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে যে জমি অধিগ্রহণ আটকাতে গেলে নন্দীগ্রামের পরিণতি হবে। বলা বাহুল্য এটা তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব। কিন্তু আজ যখন এই নীতি ব্যাকফায়ার করেছে তখন সব দোষ নিচুতলার কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা যে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন - সেটা তাঁদের পলায়নী মনোবৃত্তিকেও সামনে নিয়ে আসছে।

৪) প্রসঙ্গ conspiracy theory: বিগত দুবছর ধরে সিপিএম নেতৃত্ব কর্মীদের বুঝিয়েছেন শাসকশ্রেণীর মদতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল এবং অতিবামপন্থীরা একজোট হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে। তার কারণ তাঁরাই প্রকৃত বামপন্থী রাস্তায় হাঁটছেন। তাঁরাই একমাত্র খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ দেখছেন। এবং যেহেতু এর ফলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, তাই তারা লাগাতার অপপ্রচার করে চলেছে। প্রথমদিকে তাঁরা এই থিওরি খুব একটা ভালো দাঁড় করাতে পারছিলেন না। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, এতদিন তাহলে কি শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল না? আজ হঠাৎ কি এমন ঘটল যে শাসকশ্রেণী এরকম আদাজল খেয়ে নামলো? যেখানে ২০০৬ এর বিধানসভা নির্বাচনেও সাধারণভাবে জনমত পক্ষেই ছিল এবং শাসকশ্রেণীকেও কোন অপপ্রচার করতে দেখা যায় নি। সাধারণ মানুষ বা বাম মনস্ক বুদ্ধিজীবিদেরই বা হঠাৎ করে কেন এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে যাঁরা ২০০৬ এর নির্বাচনেও সিপিএমকে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করেছিলেন, তাঁরাই রাতারাতি 'শাসক শ্রেণী'-র লোক হয়ে গেলেন? বিশেষত: শিল্পায়নের যে নীতি সিপিএম নিয়ে চলছে, তাতে তো বড় পুঁজির খুশি হওয়ার কথা, হচ্ছেও। সিআইআই, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স থেকে শুরু করে শিল্পপতিদের সব সংগঠন বুদ্ধবাবু, নিরুপম সেনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। গোটা সিঙ্গুর পর্ব জুড়ে শাসকশ্রেণীর পত্রিকা আনন্দবাজার জোর গলায় সিপিএম-এর শিল্পনীতির পক্ষে সওয়াল করে গেছে। সব মিলিয়ে শাসকশ্রেণী তো বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিল। তাদের 'স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া' বা 'চক্রান্তের' কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনই সময়ে সিপিএম নেতৃত্ব একটা যুৎসই অজুহাত খুঁজে পেলেন। ১২৩ চুক্তি এবং আমেরিকা। এইবার রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্পের ঢং এ থিওরি নামলো - ১২৩ চুক্তিকে যেহেতু সিপিএম বাধা দিচ্ছে, তাই তাদের কোনঠাসা করার জন্য আমেরিকা তৃণমূল, মাওবাদী এবং 'সুশীল সমাজ' কে টাকা দিয়ে এই চক্রান্তের জাল বুনেছে। এই থিওরির প্রবক্তারা খুবই ইনোভেটিভ - সন্দেহ নেই। সমস্যা হল, তাঁরা এই থিওরি দিয়েই পঞ্চায়েতের ভরাডুবির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এবং আবারও পার্টির আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্বকে লঘু করে দিচ্ছেন। সিপিএম যত যত বেশী পরিমাণে এই ধরণের কল্পনাশক্তির অধিকারী নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবে, তত বেশী এরকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে - একথা বুঝতে খুব বেশী রাজনীতি বোঝার দরকার পড়ে না।

৫) এবার শিল্পায়ন এবং জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ। আপাতত: খবরের কাগজে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এবিষয়ে সিপিএম এর অভ্যন্তরে বিতর্ক তীব্র। একাংশ বলছেন জমি অধিগ্রহণের বিষয়টা এবারের নির্বাচনের খারাপ ফলের পিছনে কোন ভূমিকা নেয় নি। স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলছেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প: মেদিনীপুর - ইত্যাদি যেসব জায়গায় যেখানে জমি নেওয়া হয়েছে বা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে - সেখানে দারুণ ফল হয়েছে দলের। অথচ দ: ২৪ পরগণায় - যেখানে সেরকম কোন সম্ভবনা নেই - সেখানে ভরাডুবি হয়েছে। অন্য অংশের দাবী-জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা গ্রামের মানুষের মনে ভীতি তৈরী করেছে। সামগ্রিকভাবে তারই ছাপ পড়েছে পঞ্চায়েতের ভোটে। পরিষ্কারভাবেই প্রথম অংশ, যাঁরা জমি অধিগ্রহণের এবং বড় পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন নীতির প্রবক্তা তাঁরাই সিপিএমের মধ্যে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই অংশটি ভালোরকম পুঁজিবাদী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন। বিপ্লব-টিপ্লব এঁদের দূরতম কল্পনাতেও অ্যাজেন্ডা নয়। বরং এঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন সংসদীয় পথেই যা করার করতে হবে এবং তাই সরকারে থাকাটাই শেষ কথা (মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারেন না 'মার্কসবাদী' ইমেজের কারণে)। এঁদের কাছে 'বামপন্থা' মানে বড়জোর দক্ষিণপন্থীদের তুলণায় একটু pro-people সরকার চালানোর চেষ্টা করা। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ফলে এই অংশটির বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়নে (সেটা ম্যানুফ্যাকচারং হোক বা রিয়েল এস্টেট) এবং তার জন্য যেকোনো মূল্যে জমি অধিগ্রহণে কোনো দ্বিধা বা অপরাধবোধ কখনোই ছিল না। এখনও নেই। দুটি যুক্তিকে এনারা আত্মস্থ করেছেন: (১) সব রাজ্য শিল্পপতিদের ছাড় দিচ্ছে। আমরাও না দিলে শিল্পপতিরা আসবেন না। আমরা 'পিছিয়ে' পড়ব।

(২) বৃহৎ পুঁজির জন্য জমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদের ফলে যাই জীবিকাচ্যুতি ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত 'ট্রিকল ডাউন' এফেক্টে মোট কর্মসংস্থানের পরিমান অনেক বেশী হবে। কাজেই এই জীবকাচ্যুত মানুষগুলোর কোনো না কোনো ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। স্পষ্টত:ই এই যুক্তিদুটি নিওলবারেলিজমের কাছে আত্মসমর্পণের যুক্তি এবং এর সাথে মার্কসবাদ, শ্রমিকশ্রেণী - ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই যুক্তিদুটিকে মোকাবিলা করেই প্রতিনিয়ত বামপন্থীদের নিজেদের দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা করতে হয়। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্বের এই অংশের এই দুটি যুক্তির ওপর এমন আস্থা যে তাঁরা এখন এই বিপর্যয়ের বাজারেও assert করছেন এই বলে যে, আরো দ্রুতগতিতে জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পায়ন করতে হবে। তাতেই নাকি উদ্ভূত সংকটের থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। নেতৃত্বের যে অন্য অংশটি জমি অধিগ্রহণকে দায়ী করছেন নির্বাচনে খারাপ ফলের জন্য, তাঁদের মধ্যে আবার দু-রকম মতামত দেখা যাবে। একদল জমি অধিগ্রহণের পুরো ব্যাপারটাকে বিরোধতা করেন না। মোটের ওপর ঠিক বলেই মনে করেন। অর্থাৎ রাজনীতিগত দিক থেকে প্রথম অংশের সাথে তাঁদের মতবিরোধ নেই সেরকম। কিন্তু তাঁরা একটু ধীরে চলার পক্ষপাতী। তাঁরা চান মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের আরো বুঝিয়ে সবকিছু করতে। অর্থাৎ নিওলিবারেল চিন্তা এঁদেরকেও আচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় প্রথম অংশের মতো এদের গণতান্ত্রিক বোধকে ধ্বংস করে দিতে পারে নি। আর এঁদের মধ্যেই আর একটি অংশ পাওয়া যাবে, যাঁরা এই শিল্পায়ন নীতির পুরোপুরি বিপক্ষে বা কনফিউজ্‌ড্‌। দোদুল্যমান। তবে এই অংশটি মাইনরিটি এবং দলীয় নীতি নির্ধারণে এঁদের ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও লেখকের মতে সিপিএমের মধ্যে এই অংশটিই সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং সিপিএম ভারতের কমিউনিস্ট অন্দোলনে আদৌ কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে এই শেষ অংশটি কতটা ভোকাল এবং নীতি নির্ধারক জায়গায় নিজেদের তুলে আনতে পারছেন - তার উপর। এখন আমাদের বক্তব্যে আসা যাক। প্রথমত: নেতৃত্বের যে অংশ বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে জমি অধিগ্রহণ ভোটের ফলকে প্রভাবিত করেনি তাঁরা ভুল বলছেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, প: মেদিনীপুরের যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো অধিকাংশই চাষযোগ্য নয়। সেখানে জমি অধিগ্রহণের ফলে মানুষকে জীবিকা হারিয়ে পথে বসতে হয়েছে - এরকম উদাহরণ নেই। উল্টোদিকে সিঙ্গুর, যেখানে এর মধ্যেই ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বিনা চিকিৎসায় অথবা মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার কারণে। নন্দীগ্রামে মানুষকে ভিটে, মাটি, জীবন, জীবিকা সবকিছু থেকেই উৎখাত হতে হতো। ডানকুনিতেও প্রভূত উচ্ছেদের পরিকল্পনা রয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে এই তিনটে জায়গাতেই ভোটে সিপিএম-কে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। এই তিন জায়গাতেই রায় তাই খুব পরিষ্কার ভাবে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। এর সাথেই রয়েছে জমি অধিগ্রহণের অগণতান্ত্রিক, গা-জোয়ারি পদ্ধতি এবং সেখানকার প্রতিরোধকে পুলিশ বা দলের আশ্রিত সমাজবিরোধী দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নৃশংস 'নন্দীগ্রাম লাইন'। মানুষ আতংকিত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাদের ঘৃণার প্রতিফলন পড়েছে ভোটের বাক্সে। হ্যাঁ অন্যান্য কারণ অবশ্যই আছে, রেশন কেলেঙ্কারী যার মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। সাচার কমিটির রিপোর্ট, স্বজনপোষণ, দলীয় অন্তর্ঘাত - হয়তো সব-ই আছে। কিন্তু বাকী সব কারণকে মুখ্য বলে তুলে ধরে যাঁরা জমি অধিগ্রহণ ও সেই সংক্রান্ত দমনপীড়ন কে গৌণ করে দিতে চাইছেন, তাঁরা আসলে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের বদলে বৃহৎ পুঁজির চাহিদাকে প্রতিফলিত করছেন। (সেটা সজ্ঞানে না অজ্ঞানে সেটা অবশ্যই তাঁদের দলীয় কর্মীরাই ভালো বলতে পারবেন।) কাজেই দেখা যাচ্ছে জমি থেকে বা জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে বৃহৎপুঁজির দাবী মেটানোর এই যে শিল্পায়ন, গ্রামের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের একটা বড়ো অংশের রায় তার বিরুদ্ধে গেছে। এই ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখয়ে দিচ্ছে বৃহৎপুঁজির প্রদর্শিত উন্নয়নের পথ যদি একটি সর্বহারার পার্টর অভিমুখ হয়, তাহলে সর্বহারার তার থেকে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। শুধু সর্বহারার পার্টি বলে নয়, বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন বাড়ার ফলে কোন দলের পক্ষেই নিওলিবারেল পলিসি অনুসরণ করেও দিনের পর দিন শ্রমজীবী মানুষের আস্থা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের সব রাজ্যেই এটা দেখা যাচ্ছে। আবার পাশাপাশি এটাও আংশিকভাবে সত্য (পুরো সত্য বলা যাবেনা, কারণ এই পথটি এখনো অবধি unexplored), যে আজ যদি সিপিএম শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মতাকে প্রায়োরিটি দেয়, শিল্পপতিরা এরাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে। যতটা রঙ চড়িয়ে এই আশংকাকে দেখানো হয়, সেটা বাড়াবাড়ি হলেও সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়ার মতন ব্যাপারও না। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের একটা সংকট তৈরী হতে পারে এবং সেখান থেকে দক্ষিণপন্থীরা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সরকারকে ফেলে দিলেও দিতে পারে। এরকম সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় এই পথটিকে সিপিএম নেতৃত্ব এখনো অবধি এড়িয়ে চলেছেন, মূলত: তিনটি কারণে —

(১) তাঁদের ধারণা বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রিক এই শিল্পায়ন যাই কাজ তৈরী করতে পারুক না কেন, এর গ্ল্যামার এবং বিনিয়োগের আয়তনের কারণে তা একধরণের aspiration তৈরী করতে সক্ষম, যা বহু মানুষের মধ্যে কাজ পাওয়ার একটা আশাবাদকে চারিয়ে দিতে পারে। বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে এই যে aspiration-এর বৃত্ত, তার পরিধির বাইরে যে প্রান্তিক মানুষজন থাকবে, তাদের ঐ বৃত্তের ভিতরে প্রতিনিয়ত ঢোকা-বেরোনো চলতে থাকবে। আর এই ঢোকা-বেরোনোর চাবি যদি পার্টির হাতে থাকে,তাহলে পার্টি একভাবে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে প্রভাবটা ধরে রাখতে পারবে। বৃহৎ পুঁজির পক্ষ নিয়েও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রভাব বজায় রাখার এটাই ছিলো ফর্মুলা। এবং ২০০৬ এর নির্বাচন অব্দি যে এই ফর্মুলা ভালই কাজ করেছে, তাই দ্বিতীয় ঝুঁকির পথটায় যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি এতদিন।

(২) তাঁরা আন্দাজ করতে পারেননি যে এই শিল্পায়ন ফলপ্রসু হবার আগেই কেবলমাত্র প্রস্তুতিপর্বেই তা খেটে খাওয়া মানুষকে এতটা যন্ত্রণা দেবে। সেই যন্ত্রণা যে তাঁদের সাথে শ্রমজীবী মানুষের এতটা দূরত্ব তৈরী করতে পারে, সে-ও তাঁদের ধারণায় ছিলো না। কাজেই বৃহৎ পুঁজির দেখানো পথও যে সরকারের টিকে থাকার পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে, সেই বোঝাপড়া তাঁদের ছিলো না। উল্টে তাঁরা এটাকে সরকারে টিকে থাকার তুলনামূলক সুনিশ্চিত উপায় ভেবেছিলেন। হয়তো সাংগঠনিক শক্তি ও তদ্‌জনিত আত্মবিশ্বাসের কারণে।

(৩) তৃতীয় কারণটি বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থীরা সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে জানে। সংগ্রামের অনেকরকম হাতিয়ার হয়, সরকার তার মধ্যে একটা। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব বহুকাল যাবৎ অন্য সব হাতিয়ারকে সিন্দুকে ভরে ফেলেছে। সবেধন নীলমণ এই একট সংগ্রামের (?) হাতিয়ার পড়ে আছে। তাই তারা থিওরাইজও করেছেন, 'রিলিফ' আর কোনো অন্তর্বর্তীকালীন বিষয় নয়, স্থায়ী বিষয়। তাই এখন দীর্ঘমেয়াদী সরকারে টিকে থাকাই লক্ষ্য। তো এটা যে পার্টির লক্ষ্য (প্লাস একত্রিশ বছরের অভ্যাস), সে যে সরকারে না থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবলেই আতঙ্কিত হবে সে তো বলাই বাহুল্য। তাই শেষ অব্দি ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম — শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে আন্দোলনের মৈত্রী না গড়ে তুলতে পারলেও চলবে। কোনোরকমে প্রভাব বজায় থাকলেই হল (অর্থাৎ ভোটটি নিশ্চিত হলেই হল)। তাই বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রক উন্নয়ন যদি সেই নিশ্চয়তা দেয়, তো অসুবিধে কি? যেখানে কোনো কারখানায় কোনো শ্রমিক আন্দোলন না করেও শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টের সাথে বার্গেনিং করার ক্ষমতা হোল্ড করার কারণে, ঠিকা শ্রমিকের কন্ট্র্যাক্টরি করার কারণে প্রভাবটা বজায় রাখা যাবে। কোনো কৃষক আন্দোলন না করেও সরকারী প্রকল্প, সাহায্য, কাজের সুযোগ ইত্যাদির বন্টনের ক্ষমতা ধারণ করার কারণে কৃষক বা ক্ষেতমজুরের উপর প্রভাব বজায় রখা যাবে। এই পথ সাফল্যের সাথে অনুসৃত হয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গে গত কুড়ি বছর ধরে। শুধু সিপিএম নেতৃত্ব যেটা বুঝতে পারেনি সেটা হল অন্দোলনের মৈত্রী, লড়াইয়ের একাত্মতা আর ক্ষমতাজনিত প্রভাব এক জিনিষ নয়। আরো যেটা বোঝেননি সেটা হল বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন বাড়লে রিলিফ কর্মসূচীও মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। তখন শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মতা রিলিফ দিয়ে হবে না। হবে আন্দোলন দিয়ে। এটা বোঝেননি বলেই পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী অনেক আগেই সিপিএম কে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করছে। সেই ৯০-এর দশক থেকেই, যখন কারখানায় কারখানায় VRS এর নামে শ্রমিক ছাঁটাই চালু হয়েছে আর CITU নেতারা শ্রমিকদের বুঝিয়েছেন আন্দোলন করা যাবে না, করলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন সময় এসেছে কৃষকদের। একটি-দুটিমাত্র জমি অধিগ্রহণের ঘটনা পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছে সিপিএমের। রিলিফের একাত্মতা কতটা ঠুনকো সেটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়ে যাচেছ। দেখিয়ে দিয়ে যাচেছ আত্মসমর্পণকারী সরকারনির্ভর রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। প: বঙ্গে সিপিএম তাই এমন এক সংকটের মুখে যা তারা ইতিপূর্বে ফেস করেনি এবং যা আসলে তাদের কেন্দ্রীয় রাজনীতির অনেকগুলো জায়গাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসনের মুখে প্রকট হয়ে উঠেছে রিলিফের রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। পরিষ্কারভাবে কয়েকট প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁরা। — বৃহৎ পুঁজির পক্ষে দাঁড়াবেন? নাকি শ্রমিক-কৃষকের পক্ষে? (দুপক্ষকে একই সাথে তাল দিয়ে চলার দিন শেষ হয়ে আসছে) — যে কোন মূল্যে সরকারে টিকে থাকার লাইন আঁকড়ে থাকবেন? নাকি শ্রমজীবী মানুষের লড়াইএ নেতৃত্ব দেবেন - শিল্পপতিদের বিনিয়োগ না করার হুমকিকে উপেক্ষা করে? — একটা দক্ষিণপন্থী সরকারের মতো অন্য দক্ষিণপন্থী সরকারগুলোর সাথে পুঁজিপতিদের ছাড় দেওয়া এবং SEZ করার প্রতিযোগিতায় নামবেন? নাকি সারা ভারতজুড়ে SEZ বাতিলের দাবীতে যে ছোট বড় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে - সরকার টিকিয়ে রাখার পিছুটান ভুলে সেগুলোয় সামিল হবেন? এই প্রশ্নগুলোর সদর্থক উত্তরের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে প: বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ।

(প্রবন্ধটি www.sanhati.org- এ প্রকাশিত)

দেখে এলাম নেপালের সংবিধান সভার ভোট

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

৭ এপ্রিল কাঠমাণ্ডু থেকে প্রকাশিত প্রায় সবকটি সংবাদপত্রে দেখলাম একই ধরনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে মাওবাদীরা নিজেদের এলাকার ভোটের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করবে। ইউনাইটেড মিশনের মুখপাত্র মার্টিনের কড়া হুঁশিয়ারিও চোখে পড়ল। মার্টিন বলেছেন যে মাওবাদীরা পি.এল.এ. ক্যাম্প থেকে পি.এল.এ. সদস্যদের বের করে ভোটের কাজে লাগাবে। মার্টিন হুঁশিয়ানিও দিয়েছে এই ধরনের কাজ করলে ফল ভালো হবে না। ইতিমধ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আমেরিকা থেকে কার্টার মিশন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকও নেপালে উপস্থিত হয়েছে। প্রায় ১৪০০০ পর্যবেক্ষক নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত করেছে। ৭ ও ৮ তারিখ কাঠমাণ্ডুতে দেখলাম নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে। নেপালী কংগ্রেস, ইউ.এম.এল. এবং মাওবাদীরা জোর প্রচার কার্য চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষেরও ভোটের বিষয়ে প্রবল উৎসাহ। সবারই সাধারণভাবে মতামত এক, সেটা হল অন্য নির্বাচনের সাথে এই নির্বাচনের পার্থক্য আছে। কারণ এটা সংবিধান সভার ভোট। এর মাধ্যমে নেপালের সংবিধান তৈরি হবে। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নেপাল পরিবর্তিত হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার জন্য ৯ ও ১০ এপ্রিল মদের দোকান বন্ধ রাখতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। কাঠমাণ্ডুতে দেখলাম বেশিরভাগ রিক্সাচালক লাল পতাকা রিক্সার সামনে বেঁধে সওয়ারী তুলছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম কাঠমাণ্ডুতে বেশিরভাগ সংগঠিত শ্রমিককে মাওবাদীরা ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ করেছে। রিক্সা, হোটেল কর্মচারী প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। দেখলাম প্রতিটি অঞ্চলে ওয়াই.সি.এল (ইয়ুথ কমিউনিস্ট লীগ) কর্মীরা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। এককথায় গোটা কাঠমাণ্ডু জুড়ে সাজসাজ রব। আমরা জানিয়েছিলাম নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আমরা গ্রামে এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলে যেতে চাই। ৮ তারিখে আমার পর্যবেক্ষণ করার জায়গা ঠিক হয় ধানগিরি। কাঠমাণ্ডু থেকে ৮৫০ কিমি দূরে কৈলালি জেলায়। শুনলাম মাওবাদীদের অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি এই অঞ্চলটি। স্বাভাবিকভাবে যে প্রচার গত কয়েকদিন ধরে গোটা নেপাল জুড়ে চলছে যে মাওবাদীরা ভোটে বলপ্রয়োগ করবে, তাদের শক্তিশালী এলাকাগুলিতে, সেই অঞ্চলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে যাওয়ার সুযোগ আসাটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। মাওবাদীরা বলছে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ রাখতে, নেপালি কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বলছে মাওবাদীরা জোর জবরদস্তি করবে। কী করবে মাওবাদীরা? প্রত্যক্ষভাবে বোঝার জন্য যাত্রা শুরু হলো ধণ্ডগিরির পথে।

একটি ছোট বাসে অনেক পর্যবেক্ষক নিয়ে ৮ তারিখ বিকেল ৫টার সময় যাত্রা শুরু হলো। পোখরা, ভুটোয়াল, নেপালগঞ্জে পর্যবেক্ষকদের নামিয়ে আমরা ৯ তারিখ রাত ১১টার সময় ধণ্ডগিরি পৌঁছালাম। সঙ্গে পাঞ্জাব হাইকোর্টের আইনজীবী মানবাধিকার কর্মী বলবীর সিং সোর্চ। ধানগিরি যাবার পথে আমরা রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় বহু লোকের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকেই সংবিধান সভার নির্বাচন প্রসঙ্গে ভীষণ উৎসাহিত। এর মধ্যে শুনলাম ডং জেলায় ৭ জন মাওবাদী কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে নেপালী কংগ্রেসের দুষ্কৃতিরা। আমাদের গাড়ি যাবে ডং অঞ্চলের রাস্তা ধরে। লোকজনেরা বলতে লাগলেন কার্ফু লেগেছে, আপনারা যেতে পারবেন না। কিন্তু সেরকম কোন বাধার সম্মুখীন আমরা হলাম না। ডাং অঞ্চলে যাবার সময় দেখলাম রাস্তায় কয়েক হাজার লোক ৭ জন নিহত কর্মীর মরদেহ নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছে। একটু পরেই একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। দোকানদার বললেন, দু-বছর আগেও মাওবাদী ও রয়েল নেপাল আর্মির যুদ্ধ ছিল রোজদিনের ঘটনা। রাস্তার বিপরীতে দেখলাম নেপাল আর্মির ব্যারাক। এখানে যুদ্ধ কেমন হতো তা বোঝাবার জন্য দোকানদার তার ছোট শিশুপুত্রকে আমাদের সামনে নিয়ে এলো। দেখলাম ছোটশিশুটার গলায় ফাঁকা কার্তুজের লকেট। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম ভোট দেবেন কি? উত্তর দিল অবশ্যই দেব। এবং স্পষ্টভাবে বললো ভোট দেবো মাওবাদীদের। বললাম কেন? বললো দেশের গণতন্ত্রের লড়াই তো মাওবাদীরাই করছে। রাজা-নেপালী কংগ্রেস-ইউ.এম.এল. আমাদের দিয়েছেটা কী? বুঝতে পারছিলাম, ১০ বছরে জনযুদ্ধের পর দু-বছরের গণকার্যকলাপ মাওবাদীদের অনেক শক্ত করে দিয়েছে। এযাবৎ কাল আমরা শুনছিলাম মাওবাদী-নেপালী কংগ্রেস-ইউ.এম.এল সমান সমানভাবে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু ঐ দোকানদারই প্রথম বললো মাওবাদীরা সবচেয়ে বেশি আসন পাবে। ধানগিরিতে সাথী হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হোটেল পৌঁছালাম রাত্রি ১০টায়। সঙ্গে কমিশন কর্তৃক পাঠানো দোভাষী আমাদের জানিয়ে গেলো সকাল ৬টা ৩০-এ আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে যাব।

১০ এপ্রিল সকাল ৬-৪৫মিঃ। আমরা গাড়ি করে যাত্রা শুরু করলাম নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে। সকাল ৭টা ১০-এ পৌঁছলাম সরস্বতী লোয়ার স্কুলে। গ্রামীন অঞ্চল। নেপালের ভাষায় ডি.ভি.সি. (ভিলেজ ডেভলেপমেন্ট সেন্টার)। স্কুলের সামনে অভূতপূর্ব ভিড়। সুশৃঙ্খলভাবে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। যার অধিকাংশই নারী। থাকলাম প্রায় ৩০ মিনিট। একে একে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে। কোন গণ্ডগোল নেই। বুঝলাম, ভীতি প্রদর্শন কিছু নেই। নেই বুথের আশেপাশে কোন রাজনৈতিক দলের শিবির বা পতাকা। বুথের বাইরে নির্বাচন কমিশনের একজন ব্যক্তি বসে আছে, যার কাছে মানুষ এসে নিজের ক্রমিক সংখ্যা যা নাম মিলিয়ে নিচ্ছে। এরপর গেলাম ধানসিরির নগরপালিকা কেন্দ্রে। পৌঁছালাম ৮-১৫ নাগাদ। গিয়ে দেখলাম প্রায় ০.৫ কিমি দীর্ঘ লাইন। পোলিং অফিসারের কাছে গিয়ে নির্বাচনী পরিস্থিতি জানতে চাইলে বললেন, 'অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণভাবে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে।' এইভাবে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রায় ১৭টি কেন্দ্রে আমরা ঘুরেছি। কৈলালি জেলায় ২, ৫, ৬ নং কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট দেখেছি। গিয়েছি প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলবাড়ি অঞ্চলে। সেখানে পানীয় জল নেই। বিদ্যুৎ নেই। এক ফসলি চাষ গম। বৃষ্টি না হওয়ার জন্য তাও না হওয়ার মুখে। রাস্তা ভাঙাচোরা। ছোট নদী পেরিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। চরম দারিদ্রের মধ্যে গ্রামের মানুষেরা জীবন কাটায়। সেই গ্রামের ইন্দ্রোদয় প্রাইমারী স্কুলের সামনে সকাল ১০টায় পৌঁছালাম। শুনলাম ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে গেছে। এখানেও স্কুলের সামনে লম্বা লাইন। বিশেষ করে নারীদের। লাইনে দাঁড়ানো এমনই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম লাইনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। উত্তর দিলেন প্রায় ৪০ মিনিট। জিজ্ঞেস করলাম কেউ কোন ভীতি প্রদর্শন করলাম। দৃপ্তভাবে সেই নারী জবাব দিলেন, না। কেন ভোট দিচ্ছেন? তখন তিনি বললেন, ভোট দেবো না? দেশে সংবিধান হবে। নেপালে গণতন্ত্র আসবে। রাজা যাবে। বুঝলাম এটা যে সংবিধান সভার ভোট সেই বিষয়েও উনি ওয়াকিবহাল। মনে পড়লো স্তালিনের একটি কথা। স্তালিন লিখেছেন, যখন অগ্রনী একটি ভাবনা জনসাধারণের নিজস্ব ভাবনায় পরিবর্তিত হয় তখন সেটা এক শক্তির জন্ম দেয়। নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এবং নিজস্ব সংবিধান তৈরির যে দাবি ২০০১ সালে নেপালী কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) জনযুদ্ধ করতে করতে সূত্রায়ন করেছিল, লড়াইয়ের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় সেটা প্রত্যন্ত কৃষক রমণীকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। গোটা নেপালের রাজনীতির জীবনে এটা চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাইহোক, এই ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা পি.এল.এ. ক্যাম্পে গেছি। পি.এল.এ.-র ৭নং ডিভিশনের কম্যান্ডার অঞ্জুম আমাদের ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে গেল। দেখলাম পি.এল.এ.-র যোদ্ধারা সারিবদ্ধভাবে ভোট দিচ্ছে। মোট ১১২৮ জন ভোটারের মধ্যে দুপুর ২টোর মধ্যে ৯০৯ জন ভোট দিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৭৫ জন পুরুষ, ২৩৪ জন নারী। ইউ.এন. থেকে আসা ওমানের কর্মী বসে ভোট তদারকি করছে। আমরা কামোয়া বস্তীর ভোট দেখেছি। কামোয়া হচ্ছে রাজা কিংবা জমিদার বাড়িতে যারা কাজ করতো। তাদের পুনর্বাসন দিয়ে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। নির্বাচনী পর্যবেক্ষণের গোটা প্রক্রিয়ায় মাত্র ৪ জায়গায় গণ্ডগোল দেখেছি। রাজপুর অঞ্চলের কালিকামেলি কেন্দ্রে। এখানে নেপালী কংগ্রেসের স্থানীয় এক নেতা ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল। গ্রামের মানুষ ধরে ফেলেছে। গিয়ে দেখি ভোটগ্রহণ বন্ধ। গ্রামের মানুষ সোচ্চারে দাবী করছে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আমাদের কাছেও তারা দাবী করলো, আপনারাও নির্বাচন কমিশনকে জানান। মাত্র একটা ছাপ্পা ভোটার জন্য ভোট বন্ধ। অবাক হলাম। মনে পড়ছিল পশ্চিমবঙ্গের ভোট চিত্রের কথা। যেখানে ছাপ্পাভোট তো জলভাত, বুথ দখল, ভীতিপ্রদর্শন, ভোট দিতে না দেওয়া শাসকদলের নির্বাচন জেতার অন্যতম কৌশল। সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ জীবনে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুপচাপ এটা মেনে নেয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় না। ফলত ভোট তো দূরের কথা বহু জায়গায় মানুষ ভোটপ্রার্থী হতে পারে না। আর নেপালে শাসকদল নেপালী কংগ্রেসের এক নেতা ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে বলে গ্রামীণ মানুষ দলবদ্ধভাবে ভোট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। রাজনৈতিক সচেতনতায় তারা আমাদের কয়েক যোজন দূরে পিছনে ফেলে দিয়েছে। নেপালী কংগ্রেসের সেই নেতাকে গ্রেপ্তার করার পর ফের ভোট শুরু হলো।

গোটা নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় আমাদের সাহায্য করার জন্য ছিলেন গোবিন্দ ঢাকাল। কৈলালি জেলার সিভিল সোসাইটির জেলা সম্পাদক। তার কাছে মাওবাদীদের প্রভাবিত বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জীবনযাত্রার কথা শুনেছিলাম। প্রায় বেশিরভাগ জায়গা মাওবাদীদের রাজনৈতক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার জন্য প্রায় সমান্তরাল প্রশাসন বলছে। প্রমাণও পেলাম। ফেরার সময় গাড়ির তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত পেট্রোলপাম্প বন্ধ। গোবিন্দ ঢাকাল ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, ১০-১৫ কিমি যেতে পারবে? গাড়ির চালক বললেন পারবো। ফোনে যোগাযোগ হয়ে গেল। প্রায় ১৫ কিমি দূরে মাসুরিয়া অঞ্চলে একটি ছোট দোকান থেকে সরকারি দামে ৫০ লিটার ডিজেল নেওয়া হলো। জানতে পারলাম এটা মাওবাদীদের অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি এলাকা। প্রতিটি বিষয়ে এখানে বিকল্প ব্যবস্থা করা আছে। কাঠমাণ্ডু থেকে যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন প্রচার শুনেছিলাম মাওবাদীরা তাদের শক্ত ঘাঁটিতে নির্বাচনে বলপ্রয়োগ করবে। পি.এল.এ. ক্যাম্প থেকে জওয়ানরা ভোট বাক্স দখল করবে। কাঠমাণ্ডুর বিভিন্ন পত্রিকা ইউ.এন. মিশনের কর্তাব্যক্তিরা, নির্বাচন কমিশনের কোন কোন আধিকারিক, নেপালী কংগ্রেস এবং ইউ.এম.এলের নেতারা এই প্রচারকার্য চালিয়ে গেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এর কোন সারবত্তা নেই। সমস্ত অঞ্চলে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। অত্যন্ত সক্রিয়তার সাথে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। কোন হুমকি, জোরজবরদস্তির চিহ্ন নেই। আর হওয়াও সম্ভব ছিল না। কারণ এইসব অঞ্চলগুলিতে নির্বাচনী লড়াই শুধুমাত্র নিছক ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা ছিল নেপালী সমাজকে রূপান্তরের একটা লড়াই। যা বেশিরভাগ মানুষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন কোন একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করে তখন কোন একটা দল বা কিছু গুণ্ডা বা কোন ভীতিপ্রদর্শন তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। নেপালে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতাই হলো আমাদের।

হিমালয়ের পাদদেশে সংবিধান সভার ভোট শেষ হয়েছে। মাওবাদীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আগামী দিনে সংবিধান কীভাবে তৈরি হবে, রাজতন্ত্রের অবসানের পর গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক নেপালে রাজনৈতিক বিন্যাস কী হবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজার ক্ষমতা চলে গেলেও তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে কীভাবে নেপালকে মুক্ত করা হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, নেপালের মূল ব্যবসা মোবাইল ফোন, হোটেল, সিগারেট, হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট সব রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণে। আগামী দিনে নেপাল কোন পথে যাবে তার দিকে লক্ষ রাখবে গোটা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষ। এর মধ্যে যেমন থাকবে আগ্রহ তেমনি থাকবে সংশয়, উদ্বেগ। নেপালের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে যে বিপ্লব সম্পন্ন করলেন পারবে কি তাকে ধরে রাখতে? ভবিষ্যৎ-এর এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎ-এর গর্ভেই নিহিত আছে। কিন্তু তার আগে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পিছিয়ে পড়া অবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদ, ভাবনা, কর্মসূচী সামনে রেখে নেপালী মাওবাদীরা সংগ্রামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রামে যে বিজয় অর্জন করলেন—এই বা কম কী? এখান থেকেই শিক্ষা নিয়ে হয়তো আন্তর্জাতিকভাবে সর্বহারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। তুলে ধরবে সংগ্রামের লাল পতাকা। তাই আজকের নেপাল গোটা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক টাটকা বাতাস এনে দিয়েছে। মুক্তির ঠিকানা পৌঁছে দিচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজির ফাঁসে পঞ্চায়েতীরাজ এবং আমাদের লড়াই

শংকর দাস

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা প্রমাণ করে রাজ্যের শাসন দারুণ রকম গণতান্ত্রিক এবং বিকেন্দ্রীভূত—এরকম কথা শুনে শুনে বিরক্তি ধরে যাওয়া যদিও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, তথাপি এ বিষয়ে আলোচনা প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। শাসক সিপিএম পার্টির গুণমুগ্ধ মিডিয়া থেকে শুরু করে খোদ রাজ্য সরকারের মুখ্য কেষ্ট-বিষ্টুরা সবাই পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার গুণকীর্ত্তন করতে গিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের কথাই বলেন। বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকে দুর্নীতির প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসেন। বলেন ঐ বিকেন্দ্রীকরণ আসলে দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ। বিষয়টা ঠিক কী? পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার আসল স্বরূপটি কি সত্যিই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে? নাকি, তথ্য এবং বিশ্লেষণ দেখায় অন্য কোনো সত্য? আসুন, দেখা যাক।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন তৈরি হয় সত্তরের দশকে কংগ্রেসী রাজত্বে। যদিও ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই তার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। অর্থাৎ এই আইনটি প্রণয়ন করেছিল যারা, তারা তা প্রয়োগ করেনি। প্রয়োগ করেছিল তৎকালীন রাজনীতিতে তার বিপরীত শক্তি। এই ঘটনাটি যে জিনিসটি আমাদের কাছে পরিষ্কার করে তোলে তা হল যে নিশ্চয়ই এই আইনটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা দুটি বিপরীত রাজনৈতিক শক্তি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। আসলে অধিকাংশ আইনই এই ধরনের দ্বৈত চরিত্র সম্পন্ন হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ববিদদের একাংশ তাই প্রায়শই বলে থাকে যে, শাসকের যে কোনো আইন প্রণয়নের পেছনে আছে মানুষের সামাজিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৬০-৭০-এর উত্তাল গণআন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় তাই পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার জন্ম। নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে পাল্টা ক্ষমতার আধার গড়ে তোলার ডাক তখনও সজীব এবং তা শাসকশ্রেণীর বিশেষ করে, গ্রামের জোতদার কুলাকদের কাছে যথেষ্ঠ শিরঃপীড়ার কারণ। সুতরাং দরকার ছিল গাজরের টোপ জাতীয় এক খুচরো সংস্কার। শেষ বিচারে কোন ক্ষমতাই নেই কিন্তু আবার একটু ক্ষমতা ক্ষমতা গন্ধ লেগে থাকবে এরকম একটা গ্রামীণ ব্যবস্থা। তৈরি হল পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা, যদিও তা প্রয়োগ হল না। কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল জরুরি অবস্থা। এরপর যখন দেশব্যাপী গণআন্দোলনে জরুরি অবস্থা উঠল, সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস হারতে শুরু করল এবং পশ্চিমবঙ্গেও গঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার তখন পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়ে তার দ্বৈত চরিত্রকে নিজগুণে বিকশিত করে তুলল।

পঞ্চায়েতীরাজ এবং বামফ্রন্ট

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ষাট-সত্তরের উত্তাল গণ-আন্দোলনকে কাজে লাগিয়েই ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং গণআন্দোলনের বিভিন্ন উপাদান সেই সরকারের গায়েও যে লেগেছিল একতা তর্কের অতীত। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে গ্রামে গ্রামে যারা মুখ বুঁজে মাথা নীচু করে থাকত সেই গরীব চাষী, ভাগচাষী, দিনমজুররা মাথা উঁচু করে বাঁচার দিন এসেছে বলে ভাবতে শুরু করেছিল। একটা তথ্য থেকে এই ঘটনা আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। সরকারি কাগজপত্রের হিসাবমতো রাজ্যে ভূমিসংস্কারের পরিমাণ ৮-১০ শতাংশের বেশি হবে না। কিন্তু আমরা জানি যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ ছোট জোত আছে তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক। আসলে, পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার যত না সম্পাদিত হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে তার থেকে অনেক বেশি সম্পাদিত হয়েছিল গণ উদ্যোগে। গণরাজনৈতিক কার্যকলাপের সেই যুগে গ্রামে ঘুঘুর বাসা জোতদার মাতব্বরদের দল পিছু হঠছিল, গরীব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর জায়গায় এইভাবে তারা আঁকড়ে ধরেছিল পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে যা সেইসময় ব্যাপকভাবে প্রয়োগের জায়গায় আসে বামফ্রন্টের হাত ধরে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সিপিআই(এম) পার্টি যে ব্যাপক গণসমর্থন পেয়েছিল তা মোটেও কাকতালীয় ছিল না।

কিন্তু তার পরে কি? যে সন্ধিক্ষণে তখন আমাদের রাজ্য দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে কি তা এগিয়ে যাবে আরও সামনের দিকে? গণআন্দোলনকে আরও প্রসারিত, বিস্তৃত এবং বহুধা করে গড়ে তুলে—পঞ্চায়েতীরাজ আইন এই ব্যবস্থাকে যে শৃংখলে বেঁধে রেখেছিল তা থেকে তাকে মুক্ত করে সত্যিকার অর্থে কি গড়ে তোলার হবে গ্রামীণ জনতার সংগ্রামী ক্ষমতার আধার? নাকি কংগ্রেসী শাসনের মতো একই কায়দায় চলবে ক্ষমতা ক্ষমতা খেলার সেই পরিচিত ধোঁকাবাজী? এই প্রশ্নের সামনে বামফ্রন্ট ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিল। শুধুমাত্র পঞ্চায়েতের প্রশ্নেই নয়। সামগ্রিক রাজনীতির প্রশ্নেও বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর আপোষকামী, সুবিধাবাদী চরিত্রটি প্রকট হয়ে উঠল।

কংগ্রেসি সরকার পঞ্চায়েতীরাজ আইনে পঞ্চায়েতগুলিকে সত্যিকারের কোন ক্ষমতাই দেয়নি। জনগণের হাতে ক্ষমতা সংক্রান্ত মার্কসবাদী আলোচনা না হয় নাই করলাম। কিন্তু এমনকি বুর্জোয়ারাও ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে তত্ত্বগুলি মেনে চলে সেই তত্ত্বানুযায়ীও পঞ্চায়েতগুলি হল ঠুঁটো জগন্নাথ। কখন বলা যেতে পারে যে আপনার হাতে ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ আছে? এ সংক্রান্ত বুর্জোয়া তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্ব হলে তিন 'এফ'-র তত্ত্ব। অর্থাৎ আর্থিক ক্ষমতা (ফাণ্ড), কি কাজ করা হবে সে সংক্রান্ত ক্ষমতা (ফাংকশন) এবং যারা সেই কাজগুলি করছে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা (ফাংকশনারী) যদি আপনার থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে। কিন্তু ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে এ সবের কোন ক্ষমতাই পঞ্চায়েতের নেই। নিজ অঞ্চলে নাম কা ওয়াস্তে কিছু কর সংগ্রহ করার অধিকার তার আছে বটে যেমন গ্রামীণ যানবাহনের ওপর কর, নলকূপ বসানোর ওপর কর, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ওপর কর ইত্যাদি, কিন্তু এ সবগুলোই আবার রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষ। গ্রামীণ এলাকার সার্বিক কর সংগ্রহের এক এবং একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল পঞ্চায়েতের। সংগৃহীত করের একটা অংশ যাওয়া উচিত ছিল রাজ্য সরকারের হাতে, অবশ্যই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। অর্থাৎ গোটা সংগঠনটির চেহারা ক্ষমতা বিভাগের প্রশ্নে হওয়া উচিত ছিল পিরামিডের আকারে। তলার দিকে ক্ষমতা বেশি। উপরের দিকে কম। তা না করে তাকে করা হয়েছে উল্টো। সত্যিকারের ক্ষমতা উপরের দিকে বেশি। তলায় ছিঁটেফোঁটা। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপরেও পঞ্চায়েতের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একবার নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসারও কোন বন্দোবস্ত নেই। গণ রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিকশিত করার পরিবর্তে 'রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে শাসক বামফ্রন্ট তথা সিপিএম তখনই স্থিতাবস্থার পক্ষে চলে গেল, পঞ্চায়েতকে তার পায়ের বেড়ি থেকে মুক্ত করে গ্রামীণ জনসাধারণের প্রকৃত ক্ষমতার আধারে পরিণত করার লড়াইও তাদের দ্বারা আর গড়ে উঠবে না তা বোঝা গেল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এহেন একটা ব্যবস্থাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন।

একচেটিয়া পুঁজি এবং পঞ্চায়েতীরাজ

আজকের যুগ হলো একচেটিয়া পুঁজির যুগ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে তা হলো একচেটিয়া আন্তর্জাতিক পুঁজির আধিপত্যের যুগ। এই একচেটিয়া পুঁজি কি বিকেন্দ্রীকরণ চায় না? নিশ্চয়ই চায়। এমন বিকেন্দ্রীকরণ যা তার মৌলিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করবে না বরং পরিপুষ্ট রবে। যেমন, পঞ্চায়েতের হাতে সে নীতি নির্ধারনের কোন ক্ষমতাই দিতে চায় না। সে চায় পঞ্চায়েত যেন তার নীতিকেই দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরী করতে পারে। অর্থাৎ নীতি নির্ধারণের বিকেন্দ্রীকরণের কথা সে ভুল করেও ভাবতে পারে না। সে চায় নীতি প্রয়োগের বিকেন্দ্রীকরণ। যেমন ধরুন সাম্প্রতিককালে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ডানকুনি যেখানেই জমি অধিগ্রহণ করবে বলে সরকার মনস্থ করেছে কোথাওই সে সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতে বসে নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার তার মন্ত্রী, আমলা সহযোগে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে অন্ধকারে রেখেই। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে প্রয়োগের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েতের কাঁধে। সঙ্গত কারণেই বহু জায়গায় পঞ্চায়েত সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। জমি অধিগ্রহণের নোটিশ গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। জমি-রাজস্ব দপ্তরের কর্মীরা উপায় না দেখে অধিগ্রহণের নোটিশ গাছের গায়ে আটকে দিয়ে বিদায় নিয়েছে—এমন ঘটনাও ঘটেছে।

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ২০০০ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে নতুন বি.পি.এল. তালিকা তৈরি হতে থাকে তা নিয়ে কোথাওই পঞ্চায়েতের কোন ভূমিকা রাজ্যবাসী দেখতে পাননি। ১৯৯৯-২০০০ সালে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনে স্থির করেন যে ভারতের গ্রামাঞ্চলে মাত্র ২৭.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন এবং সেইমত তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বি.পি.এল তালিকা সংশোধন করার নির্দেশ দেন। সঙ্গে এও বলে দেন যে এই তালিকা ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু তার বেশি কখনই নয়। সুতরাং সেই নির্দেশ মতো বি.পি.এল. তালিকা তৈরি হয়। এর ফলাফল কি হল এবার শুনুন—''২০০০ সাল। গোপীবল্লভপুর থানার পিতানাউ গ্রামে সরব আলোচনা। বিডিও অফিসে নাকি নতুন বি.পি.এল. তালিকা তৈরি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, ১৯৯৩ সালের বি.পি.এল. তালিকায় গ্রামের যে পঞ্চাশটি আদিবাসী পরিবারের নাম ছিল, নতুন তালিকায় তাদের কারোর নাম নেই। আরো দেখা গেল যে, কোনও পরিবারের হয়তো একজনের নাম রয়েছে কিন্তু অন্যজনের নাম নেই। লোকরা পঞ্চায়েতে ছুটলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জানানো হলো, নতুন যে বি.পি.এল. তালিকা তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।'' (সন্তোষ রানা/ প্রকৃত দারিদ্র্য ও বি.পি.এল. তালিকা)। তাহলেই বুঝুন অবস্থা! গ্রামের দরিদ্র্য কারা বা কত শতাংশ এবং কি মাপকাঠিতেই বা তা মাপা যাবে তা সবই ঠিক করছে যোজনা কমিশন এবং রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েতের এ ক্ষেত্রেও কোন ভূমিকা নেই। পঞ্চায়েত আইনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে যে গ্রাম সংসদের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সংসদে মানুষ আলোচনা করবে ওপর থেকে নেমে আসা 'দান' গ্রামের মানুষ কিভাবে ভাগ করে নেবে তা নিয়ে। ওপরের নীতি কি হবে, ওপরের প্রতিনিধিদের কাজের মূল্যায়ন করা ও গ্রামের প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করার কোনও ক্ষমতাই গ্রাম সংসদের নেই। ফলে গ্রাম সংসদ গঠনের নামে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। একটা টিউবওয়েল কোন্ পাড়ায় বসবে সেটা স্থির করার জন্যে কামরাকামড়ি করার প্রতিষ্ঠান হল গ্রাম সংসদ। ফলে প্রভাব যার ক্ষমতা তার, এই কথার কোনও ব্যত্যয় এখানে ঘটে না।

গ্রামাঞ্চলে একশ দিনের কাজের প্রকল্পকে কেন্দ্র করেও সেই একই ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ঘোরতর সমর্থক! সুতরাং তারা এই প্রকল্পের টাকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরি জেলাশাসকের থাকে। এই ব্যবস্থার গালভরা নাম তারা দিয়েছে পি.এম. টু ডি.এম.। রাজ্য সরকারও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির জোরালো পৃষ্ঠপোষক! তারা এই ব্যবস্থাতে আপত্তি তুলেছে। তাদের বক্তব্য হলো এই ব্যবস্থাতে কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। কোন্ অঞ্চলে কত টাকা লাগবে, কত মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই সবকিছুই স্থির করতে পারে রাজ্য সরকার। কিন্তু টাকা সরাসরি জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ফলেই নাকি তার সুষ্ঠু খরচের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। টাকা পড়ে থাকছে। সুতরাং টাকা পাঠাতে হবে রাজ্য সরকারের কাছে। মজার ব্যাপার হলো কারোর বক্তব্যেই পঞ্চায়েতের কোন স্থান নেই।

কিন্তু নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলিকে কোন ক্ষমতা না দিলেও একচেটিয়া পুঁজির রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা পঞ্চায়েতকে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের ফাঁসে ক্রমশঃই আরো বেশি বেশি করে বেঁধে ফেলেছেন। গ্রামাঞ্চলে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর পঞ্চায়েতের ব্যবহার বাড়ছে। একচেটিয়া আন্তর্জাতিক পুঁজি এখন আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রকে তার প্রয়োজনমত গড়ে পিটে নিচ্ছে। ১৯৬৬-৬৭ সাল নাগাদ আমাদের দেশের কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রচলন শুরু হয়েছিল। আর আজ কার্গিল, মনসান্টো প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানির হাত ধরে এই কৃত্রিম বীজগুলির রমরমা আমাদের দেশের কৃষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় সারা দেশে ২.৯ লক্ষ টন সার ব্যবহার করা হত। ১৯৯২-৯৩-এ ১২১.৫ লক্ষ এবং ১৯৯৫-৯৬-এ আরও বেড়ে তা ১৩৯ লক্ষ টনে পৌঁছায়। উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এই সমস্ত মিলিয়ে কৃষিতে বিনিয়োগের যে বিশাল নেটওয়ার্ক কৃষকদের উত্তরোত্তর ছিবড়ে করে তুলছে আর বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির মুনাফাকে স্ফীত করে তুলছে তাতে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে পঞ্চায়েতকে। যে পঞ্চায়েতীরাজ গ্রামীন জনগণের ক্ষমতার আধারে পরিণত হতে পারত তা ক্রমশ বেশি বেশি করে একচেটিয়া পুঁজির ফাঁসে আটকা পড়ছে।

প্রকৃত ক্ষমতার জন্য লড়াই

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মুখে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে পঞ্চায়েতকে এক নাম-কা-ওয়াস্তে প্রতিষ্ঠানে পরিনত করে তোলাই হলো সিপিএম, কংগ্রেস বা বিজেপি-র মতো শাসক শ্রেণীর পার্টিগুলির প্রকৃত কর্মসূচি। বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়টিকে তারা তাদের সুবিধামত দেখে, তাদের স্বার্থে দেখে। জনগণের স্বার্থে মোটেই নয়। অন্যদিকে সংগ্রামী জনগণ পঞ্চায়েতকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহৃত এক প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে চায়। ক্ষমতার এক পাল্টা আধারে পরিণত করতে চায়। তাই নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ রাস্তা কেটে পুলিশকে ঢুকতে না দিয়ে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সাথে সাথে একচেটিয়া পুঁজির শাসনের ক্রীড়নক পঞ্চায়েতের অফিসে তালা পড়ে যাওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। আর স্বতঃস্ফূর্ত এই লড়াইয়ের সচেতন রূপ হলো সামগ্রিকভাবে পঞ্চায়েতীরাজকে একচেটিয়া পুঁজির নাগপাশ থেকে ছিন্ন করে মানুষের সত্যিকারের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ধারাবাহিক প্রয়াস।

বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংগ্রামী শক্তিগুলির কাছে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর আক্রমণকারী, একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের রাজনৈতিক দলগুলির (নির্দিষ্টভাবে যেমন সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি) বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ জরুরি। যেমন জরুরি পঞ্চায়েতে সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা তেমনই জরুরি গোটা পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাটিকে একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় পুনর্গঠিত করা। নাম-কা-ওয়াস্তে বিকেন্দ্রীকরণের নামে ধাপ্পাবাজী নয়। পঞ্চায়েতকে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতার আধারে পরিণত করার লক্ষে সংগ্রামী জনগণকে আজ অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

শ্রমিক অসন্তোষে প্রহৃত সিটু নেতা

গত ১৬ মে শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুটমিলের সিটু নেতারা ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের হাতে প্রহৃত হন। প্রায় ৫৫ দিন ধরে বন্ধ মিল খোলার দাবিতে মিলের সামনে জড়ো হন প্রায় শ-দেড়েক শ্রমিক। মিলের ভেতরে মালিকপক্ষের সঙ্গে সিটু, ইনটাক নেতাদের আলোচনা চলে। আলেচনায় মিল খোলার ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত দেয় মালিকপক্ষ। আলোচনার পরে সিটু নেতারা বাইরে এসে সেই শর্ত মেনে নিতে বললে শ্রমিকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। কেন এখনও মিল খোলা হচ্ছে না, আমরা আর কতদিন আধপেটা খেয়ে থাকব, সব শালা মালিকের দালাল—শ্রমিকদের এরকম নানান মন্তব্যে নেতারা উত্তেজিত হয়ে গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি বেধে যায়। পরে পুলিশ এসে দুই নেতাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তথাকথিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যে এখনও শ্রমিকদের থেকে মালিকপক্ষের স্বার্থই দেখছে, ইন্ডিয়া জুটমিলের এই ঘটনা সেটাই আরেকবার প্রমাণ করল।

মানয়া থেকে মিয়ামী—এক সোনালী দিনের খোঁজে

মুসাফির

কেউ একজন দূর থেকে দেখিয়ে দিল—ওই তো ওখানে। ঘাড় ঘুরিয়ে জেমেনিয়া দেখতে পেল জোসে মাউরিসিওকে। একটা খাটে দেওয়ালে হেলান দিয়ে একমনে ও ব্রেসলেট তৈরি করছে। নব্বই সেন্টে বিক্রি হয় এই ব্রেসলেটগুলো। ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে একখানা পা কাটা গিয়েছে। জেমেনিয়ার পুরনো পড়শী হলো জোসে। এখন এইভাবেই চলে তার জীবন আর জীবিকা। সামান্য হেসে ও হাত বাড়াল।

এই আপাচুলার লোকে মালগাড়ীগুলোকে বলে 'লা বেস্তিয়া'। ইংরেজিতে অর্থ হলো 'দ্য বিস্ট' অর্থাৎ জন্তু। কখনও বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কখনও মরুভূমির মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যায় একেবারে আমেরিকার সীমান্তে। আর এই ট্রেনের কাছে বসে বা ঝুলতে ঝুলতে লোকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বে-আইনী পথে আমেরিকায় ঢোকে। দীর্ঘ রাস্তার ক্লান্তিতে ঘুমে ঢুলে পড়লে আর রক্ষে নেই। হাত ফস্কে সোজা চাকার তলায়। বহু লোক মারা যায়। ভাগ্য ভাল থাকলে প্রাণটা বেঁচে যেতে পারে। খোয়া যাবে হাত অথবা পা। কখনও দুটোই। এই পঙ্গু মানুষদের জন্য আপাচুলায় অনেকগুলো সেন্টার চালায় মিশনারীরা। এইরকম একটা সেন্টারে ঠাঁই হয়েছে জোসের। একবছর আগে সে বাড়ি ছেড়েছিল এক দারুণ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে।

আপাচুলা হলো মেক্সিকোর একটা বড় রাজ্য চিয়াপাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মানুষ রোজ এসে জড়ো হয় এখানে। আইনি বা বেআইনি পথে সবাই ঢুকতে চায় আমেরিকায়। সেখানে ডলার আছে। পুঁজিবাদের মোসাহেবদের প্রচারের জৌলুস দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জড়িয়ে থাকা গরীব মানুষগুলোর কানে এক সুখী জীবনের রূপকথা শোনায়। তার টানে ছুটে আসে বহু লোক। আজও একটা দঙ্গল এসেছে। সেই দলে আছে জেমেনিয়া লোপেজ আর তার থেকে দু-বছরের জোট তার স্বামী আর্মান্দো। জোসে মাউরিসিও-এর এই অবস্থার কথা তাদের অজানা ছিল না। আজ দেখাও হলো। কিন্তু আমেরিকা যাবার পরিকল্পনা বাতিল করাও তো অসম্ভব। নিজেদের জন্য না হোক। তিনটে ছেলেমেয়ের জন্যে তো বেশকিছু রোজগারপাতি করা দরকার। সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতে হলে কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

জেমেনিয়াদের দুর্ভাগ্য গোটা দক্ষিণ আমেরিকাটাই কিউবা নয়। সেখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যপরিষেবার কোনও অভাব নেই। প্রতিটি নাগরিক আর কিছু না হোক এই পাঁচটি জিনিস যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারে তার জন্য সেখানে সরকারের কর্মতৎপরতার কোনো কমি নেই। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলে মার্কিন সরকারের তাঁবেদার শাসকদের রমরমা অথবা মিলিটারী জুন্টার শাসন। নব্বই শতাংশ মানুষের কপালে জোটে অপরিসীম দারিদ্র্য আর নামমাত্র পয়সায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম। আমেরিকার শপিং কমপ্লেক্সে যোগান দেওয়ার জন্য কলা, কফি আর কোকো উৎপাদন ক্ষেত্রের এই সস্তা শ্রমিকদের কেউ কেউ তাই অনেক সময় চলে যেতে চায় আমেরিকায়। মার্কিন সরকারের হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর এই অঞ্চল দিয়ে বে-আইনী পথে আমেরিকায় ঢোকে দেড় লক্ষাধিক মানুষ। একটা ভাল কাজের আশায়। মোটর মেকানিক আর্মান্দোও এই আশায় জেমেনিয়ার সাথে মানাগুয়া থেকে রওনা দিয়েছে তিনদিন আগে।

দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর এই যাত্রায় তাদের ভাগ্য এখনও পর্যন্ত মোটের ওপর ভালোই বলতে হবে। পথে পড়েছে আর একটা সীমান্ত। যেখানে উৎপাত চলে আইনী ভক্ষকদের। বে-আইনী পথে সীমান্ত পার হতে দেওয়ার বিনিময়ে মেয়েদের ওপর গণধর্ষণ করতে যাদের এতটুকু বাধে না। পার হতে হয়েছে খরস্রোতা সুচিয়াতে নদী। লুকিয়ে আসতে হয়েছে বলে হেঁটে বেরোতে হয়েছে জঙ্গলের রাস্তা—যেখানে ড্রাগ চোরাচালানকারী মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। এই সবকিছু ফাঁকি দিয়ে কখনও হেঁটে কখনও ট্রেকারে। কখনও ভাড়া করা সাইকেল সারাদিন চালিয়ে ওরা পৌঁছেছে তাপাচুলায়। আশ্রয় পেয়েছে পাদ্রী ফ্লোর মারিয়া রিগোনির আশ্রয় শিবিরে।

পাদ্রী রিগোনির এই আশ্রয় শিবিরের নাম কাসা ডেল্ মাইগ্রান্তে। মিশনারীরা এইরকম চারটে শিবির চালান মেক্সিকোতে। ঢুকতেই চোখে পড়বে লম্বা ডাইনিং হল আর তার একপাশে ব্যাপটিস্ট স্কালাব্রিনির মূর্তি। এখানেই চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে জনা কুড়ির এই দলটা। কথায় কথায় বাচ্চাদের কথা উঠতেই মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল জেমেনিয়া। "বাচ্চাদের বাপের বাড়িতে রেখে এসেছি। জানি না আর কখনও দেখা হবে কিনা। কিন্তু কি করব, পেটের টানে মানুষকে কত কিছুই করতে হয়। কখনও ভাবিনি..."। হঠাৎ করেই বাঁশীতে একটা পুরনো রেড ইন্ডিয়ান সুর ধরেছে রোজ রিও। হন্ডুরাস থেকে আসছে উনিশ বছরের এই তরুণ। গন্তব্য টেক্সাস।

বাইরে তখন তিন লক্ষ মানুষের এই শহর গমগম করছে। গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় মানুষের ভীড়। চলছে মোটরসাইকেল, ট্যাক্সি, ট্রাক। পথের ধারে বিক্রী হচ্ছে ডি.ভি.ডি. থেকে লজেন্স হরেকমাল। সেন্ট্রাল প্লাজাগুলো আলোয় ঝলমল করছে। কানে সেলফোন লাগানো ব্যবসায়ী থেকে হাতে বোনা সনাতনী স্কার্ট পরিহিতা মায়া মোহিনী সব ধরনের মানুষ চোখে পড়ে। জীবন বয়ে যাচ্ছে নিজের মতো। মানুষের গভীর দুঃখ। ছোট্ট হাসি, বিষাদ বা উচ্ছ্বাস—এই সবকিছু দিয়ে রোজকার মতো আজও বোনা হচ্ছে সাতরঙা নক্সি কাঁথা।

পরের দিন সকাল। যাত্রা শুরুর আগে কুড়ি জনের দলটা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা দূড়ে একটা বোর্ডে টাঙানো আছে একটা ম্যাপ। পাশে লেখা রয়েছে, হাউস্টন ২৯৩০ কিমি, শিকাগো ৩৬৭৮ কিমি, নিউ ইয়র্ক ৪৩৭৫ কিমি। হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে জেমেনিয়া আর আর্মান্দো। ওরা যাবে মিয়ামী। কোন এক পরিচিত আছে সেখানে। ইতালীয় উচ্চারণে স্প্যানিস ভাষায় পাদ্রী রিগোনি শোনাচ্ছেন তার শেষ উপদেশ "ঝামেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। টেক্সাস আর অ্যারিজোনা সীমান্তের মরুভূমি হেঁটে পার হবে না। ঐ গরম সহ্য করতে পারবে না। সীমান্তের অন্যদিকের রাস্তা চোর আর মাফিয়াতে ভর্তি। আর ওরা ধর্ষণ শুধুমাত্র মেয়েদের ওপরই চালায় না। ট্রেনের ছাদে বসে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সাবধান, ঘুমোবে না। পড়ে গেলেই মৃত্যু।"

চলতে থাকা দলটার পেছন পেছন এগিয়ে আসে গুটি কয়েক অকর্মণ্য লোক। "আমেরিকায় বাপু কাজের অভাব নেই। ওরা নিজেদের জঙ্গল কখনই নিজেরা সাফ করে না। বেঁচেবর্তে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে পেয়ে যাবে কিছু একটা। তবে অবশ্য কালোদের সঙ্গে মারামারি করতে হবে তার জন্য।" এই বলে বুড়োটা হাসতে লাগল খুব। বুক থেকে টানা হাঁটু পর্যন্ত আমাদের শতরঞ্চির মতো একখানা চাদর জড়িয়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোলচর্ম এক মেক্সিকান প্রাচীন। বিশ্রী তার হাসির আওয়াজ ছড়িয়ে যাচ্ছে তাপাচুলার তপ্ত বাতাসে। *(সিনথিয়া গোনীর মেক্সিকোস আদার বর্ডার/ ইল্লিগাল মাইগ্রেন্টস্ টু ইউ এম অবলম্বনে।)*

বাবুরাম দেওয়ান : একটি হারিয়ে যেতে বসা কাহিনী

হিমাদ্রী ভট্টাচার্য

'...পুত্র, আমার মৃত্যুর জন্যে তুমি লজ্জিত হয়ো না। বরং গর্বিত হও—কারণ, আমার এই আত্মদান চংটং চা-বাগানের ৬০০০ শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে।'....

'...আমাদের তো তবু দু-বেলা কোনোমতে দু-মুঠো জুটছে কিন্তু বাগানের অন্যান্যদের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে যাচ্ছি।...' আত্মহননের আগে নিজের সন্তানকে এই চিঠি লিখেছেন, বাবুরাম দেওয়ান। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন না—অনন্য কোনো সামাজিক সংগ্রামকে নেতৃত্বও কেখনও তিনি দেননি। তবু তাঁরই স্মরণে এই প্রতিবেদন। যেহেতু এই জীবনকে তিনি ত্যাগ করেছেন সহগামী মানুষেরই জন্য। দার্জিলিং পাহাড়ের মরিয়ং অঞ্চলের চংটং চা-বাগানের শ্রমিক বাবুরাম বঞ্চিত-লজ্জিত-হতদরিদ্র শ্রমিক-ভাইদেরই বেঁচে থাকার—বেঁচে ওঠার পথের কোনোরকম একটা দিশা খুঁজে পেতে আত্মাহুতি দেন, নিজেকেই। সেটা ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ইংরেজি ২০০৬ সাল।

এই প্রসঙ্গে চংটং বা-বাগান ও তার শ্রমিকদের কথা এসেই যায়। এই বাগানের মালিক কুখ্যাত অজিত আগরওয়াল সোনিয়া ঘনিষ্ঠ। দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষের মুখেমুখে তার সম্পর্কে নানান ভয়ঙ্কর কাহিনী ঘুরে বেড়ায়। তার চা-কোম্পানির নাম ইস্ট ইন্ডিয়া টী কোম্পানি লিমিটেড। ১৯৮৩ সালে এই চা-বাগানের মালিকানা পায় সে। চংটং বাগনের মালিকানা পাবার পর শীতকালে যখন পাতা তোলার পরিমাণ কমে যায়, সেই সময়টায় অজিত আগরওয়াল বাগান বন্ধ রাখা শুরু করে এবং এটাকে নিয়মে পরিণত করে। দুঃসহ শীতে বাগানও বন্ধ হয়ে যাবার পরিণতি—চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলোর লাগাতার অর্ধাহার-অনাহারে দিনযাপন। এদিকে শিল্প-চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য মজুরির থেকে এমনিতেই চংটং বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মাথাপিছু মজুরি ৪ টাকা ৫৫ পয়সা কম। শ্রমিকদের এ পর্যন্ত মোট বকেয়া মজুরির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। গ্র্যাচুইটি বাবদ বকেয়াও দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। পি.এফ.-এর টাকাও জমা দেয়া হয়নি বছরের পর বছর। সাপ্তাহিক রেশন, কোয়ার্টার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা সবকিছুই একেবারে বেহাল—সেই ১৯৮৪ থেকে ২005 পর্যন্ত। এই নৈরাজ্যের একটানা করুণ ছবি-ই বাস্তব হয়েছিল চংটং-এর চা-শ্রমিকদের জীবনে। কিন্তু এ ছবি বদলাতে শুরু করল যখন এইভাবে বেআইনি চা-বাগান বন্ধ-এর বিরুদ্ধে বকেয়া মজুরি, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য দাবিতে চংটং-এর ১২৫২ জন চা-শ্রমিককে আন্দোলনে সংগঠিত করতে নামল, চা-শ্রমিকদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি। নামলেন বাবুরাম দেওয়ানও, চা-বাগানের আন্দোলনের শরিক হলেন। বাবুরাম দেওয়ান ছিলেন 'চংটং' চা-বাগানের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মচারী। নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও করতেন। গ্রামের শিশুদের নিয়ে প্রাথমিক স্কুলও গড়েছিলেন তিনি। চংটং-এর মতো পাহাড়ের কোলের প্রত্যন্ত এক গ্রামবাসী উদার প্রগতিশীল বাবুরাম নিজে মরনোত্তর চোখ আর দেহদানেও অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন নিয়ম মাফিকভাবে। বছরের পর বছর চা-শ্রমিকদের ওপর নিরবিচ্ছিন্ন অসহায় পীড়নের প্রতিবাদ যখন শুরু হল তখন সে পথের সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠতে তাই তাঁর দেরি হয়নি। প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপের দাবি নিয়ে এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে প্রশাসনের দোরে দোরে ধর্না দিয়ে বেড়ালেন—যদিও সর্বত্রই

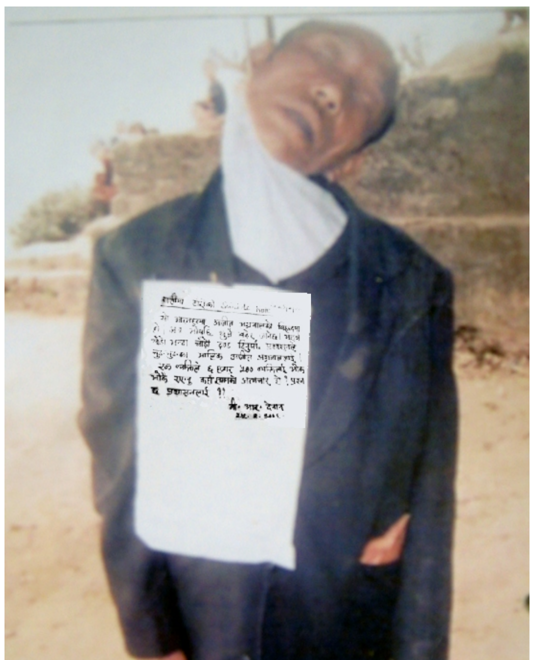

যেমন হয়, মালিকী জুলুমের পরোক্ষ মদতকারী প্রশাসন নড়ে বসল না শ্রমিকদের আবেদনে। এই হতাশাজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ হতে পারে কীভাবে ভাবতে ভাবতেই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন—বাবুরাম দেওয়ান।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এর সকালটা শুরু হয়েছিল সাদামাটা ভাবেই। কিন্তু গোটা পরিস্থিতি পুরো বদলে গেল যখন শ্রমিকরাই দেখলেন—চা-পাতা মাপার বারান্দায় কড়ি-বরগায় ঝুলছে ফাঁসে জড়ানো বাবুরামের দেহ। আর গলাতেই ঝোলান একটি লেখা। বাবুরামের 'সুইসাইড নোট'—যা আসলে একটি প্রতিবাদপত্র, যাতে লেখা আছে—"আমার আত্মাহুতি অজিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। আমার পর এই সংখ্যা আরো বাড়বে। প্রশাসন অবিলম্বে নিষ্ঠুর সেই লোকটির বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিক যার জন্যে ৬৫০০ মানুষকে খিদের জ্বালায় দিন কাটাতে হচ্ছে।"

বাবুরাম দেওয়ানের আত্মাহুতির পর কেটে গেছে আরো দুটো বছর। এই মত্যুতে নিস্তরঙ্গতা ভেঙে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সারা পাহাড়। জনগণের চাপে প্রশাসন অবশেষে বাগান খুলবার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। যদিও সার্বিক অবস্থার বিরাট কিছু বদল এখনও ঘটে যায়নি। বাবুরামের মৃত্যু নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে—কেউ কেউ বলতেই পারেন চা-শ্রমিকদের নিয়ে আরো উচ্চস্তরের সংগঠন আন্দোলন তৈরি করে যাওয়ার কাজ চালিয়ে না গিয়ে নিজের জীবনকেই শেষ করে ফেলাটা উচিত কাজ হয়নি। কিন্তু যেটা অস্বীকার করার উপায় নেই তা হচ্ছে—গোটা উত্তরবঙ্গ ও পাহাড় এলাকাতেই আজ চা-বাগান মালিকরা যে দুঃসহ নৈরাজ্য কায়েম করেছে, যেভাবে তিলে তিলে হাজার হাজার চা-শ্রমিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কোনোরকম কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা দূরে থাক প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো যেমন নির্লজ্জভাবে এই শ্রমিক শোষণের অংশীদার হয়ে পড়েছে—এবং সরকার বা প্রশাসনও এই ব্যবস্থারই শরিকেই পরিণত। একের পর এক বাগানগুলোকে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। টী-ট্যুরিজম-এর রমরম ব্যবসা গড়ে তোলার ফিকিরে উপনগরী গড়ার চেষ্টায় বাগান মুছে ফেলার কাব্যও শুরু হয়ে গেছে—চাঁদমণি চা-বাগানের শ্রমিক উচ্ছেদ এবং প্রতিবাদরত ৫ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যার স্মৃতি এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। সেখানে শ্রমিকদের এই বিপন্নতাকে দেখতে দেখতে বাবুরাম ভেতরে ভেতরে এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন যে, একটা সামাজিক আলোড়ন তুলতেই হবে এই ভাবনা তাঁকে তাড়িত করেছিল। যেমন করে মণিপুরের মহিলারা মনোরমার ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে বস্ত্রবর্জন করে পথে নেমেছিলেন, যেমন করে আইরম শর্মিলা মণিপুরে বিশেষ সামরিক আইন তোলার দাবিতে কয়েক বছর ধরে অনশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই ভাবেই সেই সব দৃষ্টান্ত থেকেই জীবনকে চূড়ান্তভাবে বিলিয়েও মানুষকে লড়াই-এর পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেওয়া যায় কিনা— সেটাই হয়ত হয়েছিল বাবুরামের প্রেরণা। বাবুরাম সেই ক্রমবিরল মানুষদেরই দলে যারা আজকের লোভতাড়িত স্বার্থান্বেষী পৃথিবীতে থেকেও মানুষের দুঃখকষ্টে স্থির থাকতে পারেন না। তাই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আত্মাহুতি দার্জিলিং পাহাড়ের নিপীড়িত চা-শ্রমিকদের মনে গভীর সংগঠিত আন্দোলনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা না রাখলেও মেহনতী জনতার প্রতি তার এই পরম ভালোবাসা পাহাড়ের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সংগঠিত হওয়ার প্রশ্নে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

Declaration No. 178/04; 18.11.04

পুঁজিবাদী চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিব্বতী জনগণ

গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে তিব্বত অশান্ত হয়ে উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ তিব্বতী বৌদ্ধরা বেশ কিছুটা অশান্ত হয়ে ওঠে। তিব্বতের রাজধানী লাসায় তিব্বতী বিদ্রোহীদের 'শান্ত' করার জন্য চীনা কর্তৃপক্ষ সামরিক ট্যাঙ্কবাহিনী সহ বিরাট সেনাবাহিনী (নামে এখনও অবশ্য গণমুক্তি ফৌজ বা পি.এল.এ) নিয়ে তিব্বতী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করেছে। চীনা সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে এই 'জনযুদ্ধে' বহু সংখ্যক তিব্বতী নিহত হয়েছেন। চীনা কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন নিহতের সংখ্যা ১০। তিব্বতীদের মতে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০। বিশ্বপুঁজির আগ্রাসন সুরক্ষিত করার স্বার্থে উদ্‌ভাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এস ই জেড)-এর অগ্রদূত বর্তমান চীনের সরকারী ভাষ্যে বিশ্বের সাধারণ গণতান্ত্রিক মানুষের ভরসা রাখা দুষ্কর। তাই চীনা ফৌজের 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' প্রয়াসে যে এক বড় সংখ্যক তিব্বতী নিহত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তিব্বতীরা ভারতে অবস্থিত দলাই লামাও অনুগামী সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন। দলাই লামার বার বার ঘোষিত স্বশাসন-এর সীমানা অতিক্রম করে তিব্বতীরা সরাসরি স্বাধীন তিব্বতের দাবি তুলেছেন। দলাই লামার 'শান্তি'-র বাণীকেও তারা উপেক্ষা করেছেন। অস্বস্তিকে পরে দালাইলামা ভারতস্থিত তিব্বতী সরকারের প্রধান-এর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছেন। ১৯৫৯ সালে তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যে দলাই লামা সেই দলাই লামা বর্তমান চীনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালানোর মতাদর্শে দীক্ষিত করতে চাইছেন গোটা তিব্বতী জনগণকে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তিব্বতে আলোচনা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন। জর্জ বুশ চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এবং চিনের রাষ্ট্রপতি হু জিন্‌থাও-কে সরাসরি ফোন করে দলাই লামার সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো এহেন পরামর্শকে হু ঝিন্‌তাও চিনের অভ্যন্তরীন ব্যাপারে মার্কিনী হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেননি বা এ জন্য কোনওরকম অসন্তোষও প্রকাশ করেননি।

এ বছর আগস্ট মাসে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এই অলিম্পিক উপলক্ষে যে মশাল দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েছে। সবচেয়ে তীব্র বিক্ষোভ হয়েছে ফ্রান্সে। ফলে সেখানে হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সর্কোজী বেজিং অলিম্পিক ফ্র্যান্স বয়কট করতে পারে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে ৮০-র দশকে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্থান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলো মস্কো অলিম্পিক বয়কট করার যে শক্তিশালী আওয়াজ তুলেছিলেন অবস্থাটা সেই পর্যায়ে যায়নি। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ১৯৫৯ সালে তিব্বতে বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে পশ্চিমী দুনিয়া তৎকালীন চীনের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, যার পরিণতিতে চিন ভারত যুদ্ধ। আজকের পরিস্থিতি কিন্তু বিন্দুমাত্র সেইদিকে পরিচালিত হচ্ছে না। বিদ্রোহী তিব্বতীদের পক্ষে ভারত, মার্কিন বা ব্রিটিশ কারোরই মদত তো দূরের কথা, প্রচ্ছন্ন সমর্থনও জুটছে না। লাসায় এত সংখ্যক মানুষ নিহত হলেন তার নিন্দা করা থেকেও বিরত থেকেছেন এরা সবাই। কেন এই পরিবর্তন? এর উত্তর খুঁজতে গেলে মাওপরবর্তী চিনের পটপরিবর্তন—যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—সেই দিকে নজর দিতে হবে। একঝলক নজর দিতে হবে তিব্বতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের ওপরেও।

তিব্বত কি সত্যি চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ? এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান নেই। ইতিহাস ঘাঁটলে অবশ্য দেখা যায় উয়ান রাজত্বের (১২৭১-১৩৬৮) সময়ে তিব্বত চিনের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে মিং বংশের রাজত্বকালে (১৩৬৮-১৬৪৪) চিন উত্তরাধিকার সূত্রে তিব্বতের দখল পায়। তবে ব্যাপারটা এতটা সহজ সরল নয়। উয়ান রাজত্বকালে মঙ্গোল রাজা চেঙ্গিস খান চিনসহ ইওরোপ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের দখল নেয়। এভাবে দেখলে মঙ্গোলিয়ার চিন ও তিব্বতীদের ওপর অধিকার মেনে নিতে হয়। মিং রাজত্বে তিব্বত যে চিনের অংশ ছিল এমন ঐতিহাসিক তথ্যেরও অভাব আছে। বরং ইতিহাসে দেখা যায় রাজা কুইঙ্গ ১৬৫২ সালে পঞ্চম দলাই লামাকে একটি স্বাধীন রাজ্যের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অবশ্য মাঞ্চু বংশের রাজত্বকালে (১৬৪৪-১৯১১) তিব্বতীরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কুইঙ্গ-এর সেনাবাহিনীকে তিব্বতে ডেকে এনেছিলেন। চিনের জনযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় লংমার্চের সময় মাও-সে-তুঙ্-এর নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ যখন তিব্বতের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল, তখন মাও-সে-তুঙ্ সততার সাথেই বলেছিলেন, 'আমাদের এটা একটা বিদেশী ঋণ—পরবর্তীকালে আমরা এই ঋণ পরিশোধ করে দেব।' ১৯১৩-১৪ সালে সিমলাতে ব্রিটিশপন্থী তিব্বতীদের নিয়ে তৎকালীন ভারত শাসনকারী ইংরেজ সরকার চিন, ভারত ও তিব্বত নিয়ে এক চুক্তি রচনা করেন। তৈরি হয় বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইন। তিব্বতের একটা অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় এই সীমানা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে। চিন অবশ্য এই চুক্তিকে মেনে নেয়নি, তারা বলেছিল তিব্বত যেহেতু চিনের অংশ তাই তিব্বতীদের নিয়ে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে না। ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল তিব্বতের এক অংশ হয়েও ভারতের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়, সকলেই জানেন এই ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে ভারত চিন সিমান্ত যুদ্ধ।

তবে তিব্বত স্বাধীনভাবেই থাকুক বা চিনের অন্তর্ভুক্তভাবেই থাকুক, তিব্বতে সাধারণ মানুষের অবস্থা কোনও দিনই সুন্দর ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, দাস ব্যবস্থা, দলাই লামাদের স্বেচ্ছাচার তিব্বতকে এক মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। ১৯৪৯ সালে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চিনে গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর চিনে যখন সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত, তখন চিন তিব্বতের রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৪৯ সালে তিব্বতে হস্তক্ষেপ করে, তিব্বতে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারও দাস ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়। তিব্বতে শিক্ষার প্রসার ঘটে। লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন, তিব্বতীরা চরম দারিদ্র কাটিয়ে উঠে আধুনিক তিব্বত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। বৃহৎ সংখক তিব্বতী শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং আধিকারিক তিব্বতে নির্বাহী ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয়। সে সময়ে তিব্বতে ২,৫০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। চিন সরকার সে সময়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ ইউয়ান তিব্বতে বিনিয়োগ করেন। বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনস্বাস্থ্য-এর ক্ষেত্রগুলিতে বিশাল অগ্রগতি হয়। চিন সরকার মন্টেসরীগুলি সহ বিভিন্ন শিশু শিক্ষা ও বিনোদনমূলক সংস্থাগুলিকে পুনর্গঠিত করেন। তিব্বতীদের সংখ্যা ১৯৫০ সালে ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০ লক্ষতে দাঁড়ায়। এদের অধিকাংশই কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক হয়ে ওঠেন। তিব্বত তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চিনের প্রভাবে অনেকাংশেই এক সভ্য ও আধুনিক প্রদেশ হয়ে ওঠে। সবশেষে ১৯৫১ সালে চিন এবং তিব্বত ১৭ দফা অংশ সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তি অর্জিত হওয়ার কথা বলা হয়। সেই সময় চতুর্দশ দলাই লামা এই মুক্তি অর্জনকে স্বীকার করে নেন এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছায় তিব্বত চিনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা বাহুল্য সমাজতান্ত্রিক চিনে তিব্বতের এই অন্তর্ভুক্তি পুঁজিবাদী দুনিয়া ভালো চোখে দেখেননি। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানীতে ১৯৫৯ সালে তিব্বতে দলাই লামাদের উদ্যোগে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। দলাই লামারা অবশ্য জনসমর্থন বিশেষ আদায় করতে পারেনি। হালে পানি না পেয়ে লামাচক্র মার্কিন মদতে ভারতে হিমাচল প্রদেশে বিদেস্থিত সরকার গঠন করেন। ধর্মশালায় অবশ্য আজও এই সরকার বিরাজমান। তারপর প্রায় তিরিশ বছর তিব্বতে কোন অশান্তি বিদ্রোহ বা বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়নি।

এরমধ্যে ১৯৭৬ সালে মাও-সে-তুঙের মৃত্যুর পর চিনের পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। মাও নেতৃত্বাধীন চিনা কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা স্বীকৃত এক দু-বার বহিষ্কৃত পুঁজিবাদী পথের পথিক তেং শিয়াও পিং চিনের কর্ণধার হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে চিন। 'পুঁজিবাদ অল্পকিছু লোককে ধনী হওয়ার সুযোগ দেয়, কিন্তু সমাজতন্ত্রের সবাই ধনী হতে পারে' এই তত্ত্ব ফেরি করে তেংশিয়াও পিং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অন্তঃসারকে টুটি টিপে হত্যা করেন। ধনী হয়ে ওঠার লালসায় চিনা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ফলে সারা চিন জুড়ে শুরু হয় অসুস্থ পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা। চালু হয় বাজার অর্থনীতি, ছড়িয়ে পরে ইয়াংকি কালাচার। আর চিনা শাসক চক্র এক প্রতিক্রিয়াশীল শোষক চক্র হয়ে ওঠে। চিনা গণফৌজ বা পিপলস লিবারেশন আর্মি হয়ে ওঠে এক প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী। এর বিরুদ্ধে চিনা জনগণের প্রথম ক্ষোভ ফেটে পড়েছিল ১৯৮৯ সালে তিয়েন-আন-মিন স্কোয়ারে। মাও-সে-তুঙের স্লোগান 'সদর দপ্তরে কামান দাগো' তখন চিনে ধুলায় লুণ্ঠিত। চিন সরকার বিরাট সামারিক বাহিনী দিয়ে এই বিক্ষোভ দমন করে ও পুরো ব্যাপারটাই পুঁজিবাদীদের চক্রান্তের ফল বলে বিক্ষোভে নিহিত জনগণ-এর সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চাহিদাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে ১৯৮৭ সালে তিব্বতীরাও চিনা সরকার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হন। আজকের চিনা প্রেসিডেন্ট সেই সময় চিনা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা। তিনি তিব্বতে যান। তিনি দলাই লামাকে ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস-এর উপ-চেয়ারমম্যান হবার প্রস্তাব দেন। বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। এখানে উল্লেখ্য স্বয়ং তেং শিয়াও পিংই ১৯৭৯ সালে দলাই লামাকে চিনে আলোচনার জন্য ডেকে দুপক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিলেন। চিনের পট পরিবর্তন এবং চিনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার আলোচনার প্রক্রিয়াতেই দলাই লামা চক্র স্বাধীন তিব্বতের দাবি ছেড়ে তিব্বতী স্ব-শাসনের দাবিতে সরে আসেন। সামন্ততান্ত্রিক চিনের প্রতি লামাচক্রের যে মনোভাব ছিল পুঁজিবাদী চিনের প্রতি দলাই লামাদের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎই এর জন্য দায়ী।

এর মধ্যে পুঁজিবাদী অসম বিকাশের কারণে তিব্বতীরা মূল চিনা ভূখণ্ডের থেকে পিছিয়ে পড়ে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও আজকের তিব্বতের এক বড় সমস্যা, ১৯৫৪ সালে যে ব্যবহার তিব্বতীরা চিন থেকে পেয়েছিলেন তা আজ আর নেই। চিনে যেমন বেকার সমস্যা ভয়াবহ তার প্রভাব তিব্বতেও পড়তে বাধ্য। সব মিলিয়ে বঞ্চনা, হুমকি ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধেই আজ মাথা তুলেছেন তিব্বতীরা। এ শুধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ নয়, এ হলো গণবিক্ষোভ। আর তাই বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে বিক্ষোভ দখল করতে বাধ্য হচ্ছেন হুঝিন তাওরা। ভারত দলাই লামা তথা তিব্বতীদের সাফ জানিয়ে দিয়েছে ভারত চিন সুসম্পর্ক নষ্ট করা চলবে না। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৯০ সাল থেকে চিন ভারতের কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিককরণের বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ কাশ্মীরের দমন নীতি আর তিব্বতের দমননীতি একসাথেই চলুক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জারের রাশিয়া যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেছিল, অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় এসে লেনিন সে সমস্ত অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) চালু করে চিনের সমাজতন্ত্রের কফিনে যারা শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছেন তাঁদের কাছে অবশ্যই লেনিনের শিক্ষা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক।

সবশেষে বলি ১৯৫১ সালে যারা তিব্বতীদের বিদ্রোহে উস্কানী দিয়েছিলেন সেই মার্কিন ব্রিটিশ ভারত চক্র আজ বিদ্রোহী তিব্বতীদের পাশে নেই কারন আজকের চিনের প্রতি সেই বিদ্বেষও তাদের নেই। আর তাই খোদ বেজিং-এ অলিম্পিক মশাল দৌড়ের উদ্বোধন করে সেখানকার বৃটিশ রাষ্ট্রদূত।

বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ বিরোধী সন্ত্রাস যদি শক্তিশালী হয়, যদি বিশ্ব বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়—যা এই মুহূর্তে এক কঠিন কাজ—তবে তার প্রভাব চিনে গিয়েও পড়বে। সেই প্রক্রিয়াই চিনা জনগণ চিনকে নিয়ে যেতে পারবে সমাজতন্ত্রের পথে আর তার মধ্যে দিয়ে সমাধান হতে পারে তিব্বত সমস্যার।

সত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক : অমৃত পৈড়া**